ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা প্রকল্প

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি
এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর যৌথ প্রয়াস। আর্থিক সহযোগিতায়: ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশন

ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা প্রকল্প

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি
এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর যৌথ প্রয়াস। আর্থিক সহযোগিতায়: ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশন

ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা প্রকল্প
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১৬

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
অধ্যাপক এ কে আজাদ খান
অধ্যাপক হাজেরা মাহতাব
অধ্যাপক আকতার হোসেন
অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরী
অধ্যাপক মো: ফারুক পাঠান
অধ্যাপক তোফায়েল আহমদ
অধ্যাপক এ কে এম মহিবুল্লাহ
অধ্যাপক মো: ফরিদ উদ্দীন
অধ্যাপক আশরাফউজ্জামান
অধ্যাপক সামসাদ জাহান শেলী
ডা. ইসরাত জাহান

নির্বাহী সম্পাদক
ডা. বিশ্বজিত ভৌমিক

সম্পাদকমন্ডলী
ডা. তারীন আহমেদ
ডা. ফারিয়া আফসানা
ডা. তাসনিমা সিদ্দিকী
ডা. রওশন হোসনে জাহান
ফরিদ কবির
শামসুন নাহার

মুদ্রণ
বাডাস-আরভিটিসি প্রিন্টিং প্রেস
৪৭৭ মেডিকেল রোড, জুরাইন, ফোন: ৭৪৪৫২২৮

রুম নং: ২০৬, ২য় তলা, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল
১২২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল হেল্প লাইন: ০১৭০৫ ৩৬০২৬৮, ০১৫৩ ৪১১৮৪৫৪
ওয়েবসাইট: www.pcc-badas.org, ই-মেইল: info@pcc-badas.org
ফেসবুক: facebook/pcc-badas, স্কাইপ: skype/pcc-badas
ইউটিউব: youtube/pcc-badas

ভূমিকা

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিস মহামারী হিসেবে দেখা দিয়েছে। রোগের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯৭ সালে ডায়াবেটিসকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশনের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, ২০১৪ সালে পৃথিবীতে মোট ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা ৩৮.২ কোটির বেশি, যা ২০৩৫ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ৪৭.১ কোটিতে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, উন্নত বিশ্বের দেশগুলির তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ডায়াবেটিস বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। ২০২৫ সাল নাগাদ উন্নত বিশ্বের দেশগুলিতে যেখানে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা বাড়বে প্রায় ৪২ শতাংশ হারে, সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৃদ্ধির এই হার গিয়ে দাঁড়াবে ১৭০ শতাংশে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অসংক্রামক রোগসমূহ বিশেষ করে, ডায়াবেটিস দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। দেশে ডায়াবেটিস ও প্রি-ডায়াবেটিসের পাশাপাশি গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের (জিডিএম) হারও দ্রুত বাড়ছে। পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের হার ১০-১৪ শতাংশ। দেশে ডায়াবেটিসের পাশাপাশি ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা বিশেষ করে, পক্ষাঘাত, হৃদরোগ, পায়ে পচনশীল ক্ষত, অন্ধত্ব, কিডনির কার্যক্ষমতা লোপ পাওয়ার হার বাড়ছে। পাশাপাশি বাড়ছে মহিলাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস, বেশি ওজনের শিশুর জন্ম ও জন্মের পরই শিশুর মৃত্যু, অকালে সন্তান প্রসব এবং শিশুদের জন্মত্রুটি বৃদ্ধির হারও। সেই সাথে এই সব জটিলতায় মাতৃমৃত্যুর হারও বাড়ছে।

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন বিশেষ করে, অধিক চিনি, তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার, শারীরিক পরিশ্রমে অনীহা, মুটিয়ে যাওয়া, মানসিক চাপ, মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতাকে ডায়াবেটিসের অন্যতম ঝুঁকি হিসেবে দেখা হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতার ফলে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের পাশাপাশি কম ওজনের শিশু জন্ম নেবার ঝুঁকি যেমন বেড়ে যায়, তেমনি এইসব শিশুদের ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিও অনেকগুণ বেড়ে যায়। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, যে-সব বিবাহিত মহিলা প্রি-কনসেপশন কাউন্সিলিং বা গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা নিয়েছে অর্থাৎ গর্ভধারণের আগে রক্তে শর্করার পরিমাণ, রক্তচাপ, রক্তশূন্যতা, পুষ্টি অবস্থা, প্রস্রাবে আমিষ ও ইনফেকশন পরীক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শমত যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে, তাদের মধ্যে মাতৃত্বকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতার হার অনেক কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস সমিতির মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো গর্ভধারণ-পূর্ব পরামর্শ সেবা গ্রহণ এবং এর মাধ্যমে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হ্রাস করতে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্বেগের বিষয়, বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এখনো গর্ভধারণ-পূর্ব পরামর্শ সেবা নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সামাজিক সচেতনতা এখনো গড়ে ওঠেনি।

পৃথিবীর প্রতিটি সমাজে ও ধর্মে ধর্মীয় নেতাদের (বিশেষ করে ইমাম ও পুরোহিতদের) যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। ধর্মীয় নেতাদের সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করে আফ্রিকা ও এশিয়ার বেশ কিছু দেশ ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ, এইডস, মা ও শিশুর পুষ্টিহীনতা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে। এসব দেশ ইতোমধ্যে এর সুফলও পেতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম এবং অন্যান্য দেশের মতো এখানেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ধর্মীয় নেতাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। মুসলিম বিয়েতে বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক এবং তা অবশ্যই একজন নিবন্ধিত কাজীর মাধ্যমে স্বীকৃত হতে হয়। বিয়েতে কাজীদের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি (বাডাস) বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজীদের মাধ্যমে নব-দম্পতিদের মধ্যে প্রি-কনসেপশন কাউন্সিলিং সেবা দেয়ার মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতা, বিশেষ করে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস, মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য একটি দু'বছর মেয়াদি বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা গ্রহণ করেছে।

প্রকল্পটির যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। জনসংখ্যা সমীক্ষা ২০১৪-এর তথ্য মতে, এখনো বাংলাদেশে গর্ভকালীন মা ও শিশুমৃত্যুর হার যথেষ্ট বেশি। পাশাপাশি বেশি ওজনের শিশুর জন্ম ও জন্মের পরই শিশুর মৃত্যু, অকালে সন্তান প্রসব

এবং শিশুদের জন্মত্রুটিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডায়াবেটিস বা গর্ভকালীন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা, রক্তশূন্যতা, মূত্রনালি ও মূত্রথলির ইনফেকশন ও মূত্রে আমিষের উপস্থিতিকে এসবের উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। জটিলতাগুলো কমাবার জন্য উন্নত চিকিৎসা সেবা দেয়ার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি) গৃহীত মা ও শিশুমৃত্যু হ্রাসে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে মা ও শিশুমৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের এই অর্জন ইতোমধ্যেই জাতিসংঘ ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সরকার ও অন্যান্য দেশি-বিদেশি সংস্থার মতো, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিও মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির এসব কর্মসূচি বিশেষভাবে, চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে বাংলাদেশে গর্ভবতী মায়েদের ডায়াবেটিস নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ আগের চাইতে অনেক বেড়েছে। পাশাপাশি গর্ভকালীন ডায়াবেটিসজনিত (জিডিএম) মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে। বর্তমান প্রকল্পটি থেকে প্রশিক্ষিত কাজীরা বিয়ের অনুষ্ঠান নিবন্ধন করার পাশাপাশি নবদম্পতিকে পরামর্শ সেবা গ্রহণের সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং অসংক্রামক রোগ বিশেষ করে, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবেন।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ

১. গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা এবং অসংক্রামক রোগ বিশেষ করে, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বাড়াবার কৌশল বিষয়ে কাজীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

২. স্বাস্থ্যকর্মীদের (চিকিৎসক, নার্স ও ডায়াবেটিস এডুকেটর) গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা এবং গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩. প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি এবং এর অধিভুক্ত সমিতির কেন্দ্র ও হাসপাতালে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা কেন্দ্র চালু করা।

৪. প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী ও কাজীদের মাধ্যমে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা এবং অসংক্রামক রোগ বিশেষ করে, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৫. গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা এবং গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ, লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি তৈরি করা।

৬. গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা এবং অসংক্রামক রোগ বিশেষ করে, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধ সম্পর্কীত একটি ওয়েবসাইট চালু করা।

৭. মোবাইল হেল্প লাইনের মাধ্যমে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা এবং গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধ সম্পর্কীত পরামর্শ প্রদান করা।

মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রাণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে মা ও শিশু-মৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু সরকার এই হারে সন্তুষ্ট নয় বরং তা আরও হ্রাস করিয়ে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সাথে সমতা আনতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার মনে করে ডায়াবেটিস বা গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বাংলাদেশে মা ও শিশু ও মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ডায়াবেটিস চিকিৎসা ও প্রতিরোধ কর্মসূচির পাশাপাশি মা ও শিশু-স্বাস্থ্য উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি এই কাজে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা করতে বদ্ধ পরিকর।

মুসলিম বিয়েতে নিকাহ্ রেজিস্ট্রার তথা কাজীগণের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি কাজীগণের মাধ্যমে নব-দম্পতিদের মধ্যে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা গ্রহণ বিষয়ক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। বর্তমান প্রকল্পটি থেকে প্রশিক্ষিত কাজীগণ বিয়ে নিবন্ধন করার পাশাপাশি নব দম্পতিকে পরামর্শ সেবা গ্রহণের সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করবেন। কাজীগণের এরূপ ভূমিকায় অসংক্রামক রোগ বিশেষ করে, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি।

আমি এ প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

২৪/১০/২০২১

আনিসুল হক, এমপি

সভাপতি
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি

বাণী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অসংক্রামক রোগসমূহ বিশেষ করে, ডায়াবেটিস দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। দেশে ডায়াবেটিস ও প্রি-ডায়াবেটিসের পাশাপাশি গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের (জিডিএম) হারও দ্রুত বাড়ছে। পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের হার ১০-১৪ শতাংশ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতার ফলে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের পাশাপাশি কম ওজনের শিশু জন্ম নেবার ঝুঁকি যেমন বেড়ে যায়, তেমনি এইসব শিশুদের ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিও অনেকগুণ বেড়ে যায়।

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, যে-সব বিবাহিত মহিলা গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা গ্রহণ অর্থাৎ গর্ভধারণের আগে রক্তে শর্করার পরিমাণ, রক্তচাপ, রক্তশূন্যতা, পুষ্টি অবস্থা, প্রস্রাবে আমিষ ও ইনফেকশন পরীক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শমত যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে, তাদের মধ্যে মাতৃত্বকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতার হার অনেক কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস সমিতির মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো গর্ভধারণ-পূর্ব পরামর্শ সেবা গ্রহণ এবং এর মাধ্যমে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হ্রাস করতে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্বেগের বিষয়, বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গর্ভধারণ-পূর্ব পরামর্শ সেবা নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সামাজিক সচেতনতা এখনো গড়ে ওঠেনি।

পৃথিবীর প্রতিটি সমাজে ও ধর্মে ধর্মীয় নেতাদের (বিশেষ করে ইমাম ও পুরোহিতদের) যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। ধর্মীয় নেতাদের সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করে আফ্রিকা ও এশিয়ার বেশ কিছু দেশ ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ, এইডস, মা ও শিশুর পুষ্টিহীনতা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে। এসব দেশ ইতোমধ্যে এর সুফলও পেতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম এবং অন্যান্য দেশের মতো এখানেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ধর্মীয় নেতাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। মুসলিম বিয়েতে বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক এবং তা অবশ্যই একজন নিবন্ধিত কাজীর মাধ্যমে স্বীকৃত হতে হয়। বিয়েতে কাজীদের গুরুত্ব বিবেচনা করে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায়, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজীদের মাধ্যমে নব-দম্পতিদের মধ্যে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা গ্রহণ বিষয়ক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য দু'বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমান প্রকল্পে ৪০০ জন কাজী ও ৩০০ জন স্বাস্থ্যসেবা কর্মীকে (চিকিৎসক, নার্স এবং ডায়াবেটিস এডুকেটর) বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং পাশাপাশি বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ও অধিভুক্ত সমিতির কেন্দ্র ও হাসপাতালসহ সরকারি ও বেসরকারি মাতৃসদনে ৫০টি গর্ভধারণ-পূর্ব পরামর্শ সেবা কেন্দ্র চালু করা হবে।

আমি আশা করি, বর্তমান প্রকল্পটি নবদম্পতিদের মধ্যে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা গ্রহণের সুবিধা এবং বিভিন্ন অসংক্রামক রোগ বিশেষ করে, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

অধ্যাপক এ কে আজাদ খান

সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে গর্ভকালীন মা ও শিশু বেশ কিছু ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, পুষ্টিহীনতা, রক্তস্বল্পতা, মূত্রনালীর ইনফেকশন ইত্যাদি। এর ফলে গর্ভকালীন মা ও শিশুর মৃত্যু ও পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যাও হতে পারে যেমন অকালে সন্তান প্রসব, কম বা বেশি ওজনের শিশু, শিশুর জন্মগত ত্রুটি ইত্যাদি। এসব জটিলতা কমানোর জন্যে উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি এগুলো প্রতিরোধের ব্যবস্থা করাও জরুরি। এক্ষেত্রে নব-দম্পতিদের সচেতন করতে পারলে এই রোগগুলোকে অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। প্রশিক্ষিত কাজীরা বিয়ের অনুষ্ঠান নিবন্ধন করার সময় এই কাজটি সহজেই করতে পারেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাজী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যারা পরবর্তী কালে উল্লেখিত রোগগুলো প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।

আমি আশা করি, বর্তমান প্রকল্পটি নব-দম্পতিদের মধ্যে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করবে, যা ভবিষ্যতে গর্ভকালীন সমস্যাগুলো কমাতে সাহায্য করবে।

এই প্রকল্পটি সফল করার জন্য আমাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।

আমি এই প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আবু সালেহ শেখ মোহাঃ জহিরুল হক

International Diabetes Federation

ভাইস-প্রেসিডেন্ট
ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন

বাণী

বাংলাদেশ সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে মা ও শিশুমৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও এখনো এই হার উন্নত দেশগুলির তুলনায় যথেষ্ট বেশি। গর্ভকালীন ডায়াবেটিস এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হতে পারে বলে মনে হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি দেশব্যাপী ডায়াবেটিস চিকিৎসা প্রসার ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নেও কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির "ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা প্রকল্পটি" থেকে প্রশিক্ষিত কাজীগণ বিয়ের অনুষ্ঠান নিবন্ধন করার পাশাপাশি গর্ভধারণ-পূর্ব পরামর্শ সেবা গ্রহণের সুবিধা সম্পর্কে নবদম্পতিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবেন। পাশাপাশি, নবদম্পতিরা দেশব্যাপী চালু হতে যাওয়া গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে সঠিক পরামর্শ ও উন্নত চিকিৎসা সেবা পাবেন বলেও আশা রাখি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বর্তমান প্রকল্পটি মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধে বিশ্বে একটি অনুকরণীয় মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রকল্পটিকে এগিয়ে নিতে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে আমি ধন্যবাদ জানাই।

Akhtar Hossain

প্রফেসর আখতার হোসেন

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১)
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

বাণী

পৃথিবীতে প্রতিদিন যতজন মহিলা গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের সাথে সম্পর্কিত প্রতিরোধযোগ্য জটিলতায় মারা যায় তার ৯৯ শতাংশ মায়ের মৃত্যু হয়ে থাকে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই। ফলে এখনো বাংলাদেশে গর্ভকালীন মা ও শিশুমৃত্যুর হার যথেষ্ট বেশি। সার্বিক অবস্থার উন্নতির জন্য যেমন প্রয়োজন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী, তেমনি প্রয়োজন পরিকল্পিত গর্ভধারণ ও গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা গ্রহণ বিষয়ে দেশব্যাপী সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো।

ধর্মীয় নেতাদের বিশেষ করে ইমাম ও পুরোহিতদের সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করে পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে মা ও শিশুর পুষ্টিহীনতা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে। আমি জেনে আনন্দিত যে, বিয়েতে কাজীদের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজীদের মাধ্যমে নব-দম্পতিদের মধ্যে প্রি-কনসেপশন কাউন্সিলিং সেবা দেয়ার মধ্য দিয়ে মাতৃত্বকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতা, বিশেষ করে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস, মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য দু'বছর মেয়াদি একটি বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা গ্রহণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি বর্তমান প্রকল্পটি থেকে প্রশিক্ষিত কাজীরা পরিকল্পিত গর্ভধারণ ও গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা গ্রহণ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবেন।

আমি এ প্রকল্পের সব ধরনের সাফল্য কামনা করি।

১৫/১৫/১৬।
বিকাশ কুমার সাহা

চেয়ারম্যান
সম্মিলিত ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ফোরাম
জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ

বাণী

একজন সুস্থ শিশু আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ নিয়ামত।

গর্ভকালীন সময়ে যদি মায়ের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ওজনাধিক্য, পুষ্টিহীনতা, রক্তস্বল্পতা বা প্রস্রাবের ইনফেকশন থাকে, তবে তা মায়ের পাশাপাশি শিশুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, যেমন- কম বা বেশি ওজনের শিশু, জন্মগত ত্রুটি, গর্ভকালীন বা জন্মের পর শিশুর মৃত্যু, অকালে সন্তান ইত্যাদি। তাই প্রত্যেক মহিলার সন্তান ধারণের আগেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

আমি জেনে খুশি হলাম যে, নিকাহ রেজিস্ট্রারদের (কাজীদের) গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজী সাহেবদের মাধ্যমে নব-দম্পতিদের মধ্যে প্রি-কনসেপশন কাউন্সিলিং সেবা দেয়ার মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন ও প্রসবকালীন জটিলতা, বিশেষ করে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস, মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য দু'বছর মেয়াদি একটি বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা গ্রহণ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষিত কাজী সাহেবগণ বাল্যবিবাহের কুফল, পরিকল্পিত গর্ভধারণ ও গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা গ্রহণ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবেন। প্রকল্পটি সফল করার জন্য সম্মিলিত ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ফোরাম- জাতীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

ছাবের আহাম্মদ (কাজী ছাব্বীর)

সূচি

মডিউল ১ ১৩-৩৪

প্রথম অধ্যায় : গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিবার পরিকল্পনা ১৯

তৃতীয় অধ্যায় : বাল্যবিবাহ ও জন্মব্যবধান ২৩

চতুর্থ অধ্যায় : রক্তের গ্রুপ ২৭

পঞ্চম অধ্যায় : গর্ভধারণ-পূর্ব টিকা (ইমুনাইজেশন) ৩১

মডিউল ২ ৩৫-৫৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : ডায়াবেটিস মেলাইটাস ৩৫

সপ্তম অধ্যায় : গর্ভকালীন ডায়াবেটিস (জিডিএম) ৪১

অষ্টম অধ্যায় : স্থূলতা ৪৭

মডিউল ৩ ৫৫-৭৪

নবম অধ্যায় : রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) ৫৫

দশম অধ্যায় : উচ্চ রক্তচাপ ৬১

একাদশ অধ্যায় : প্রি-একলাম্পশিয়া ও একলাম্পশিয়া ৬৭

দ্বাদশ অধ্যায় : মূত্রনালির সংক্রমণ (ইউটিআই) ৭১

তথ্যসূত্র ৭৫

মডিউল ১

প্রথম অধ্যায়

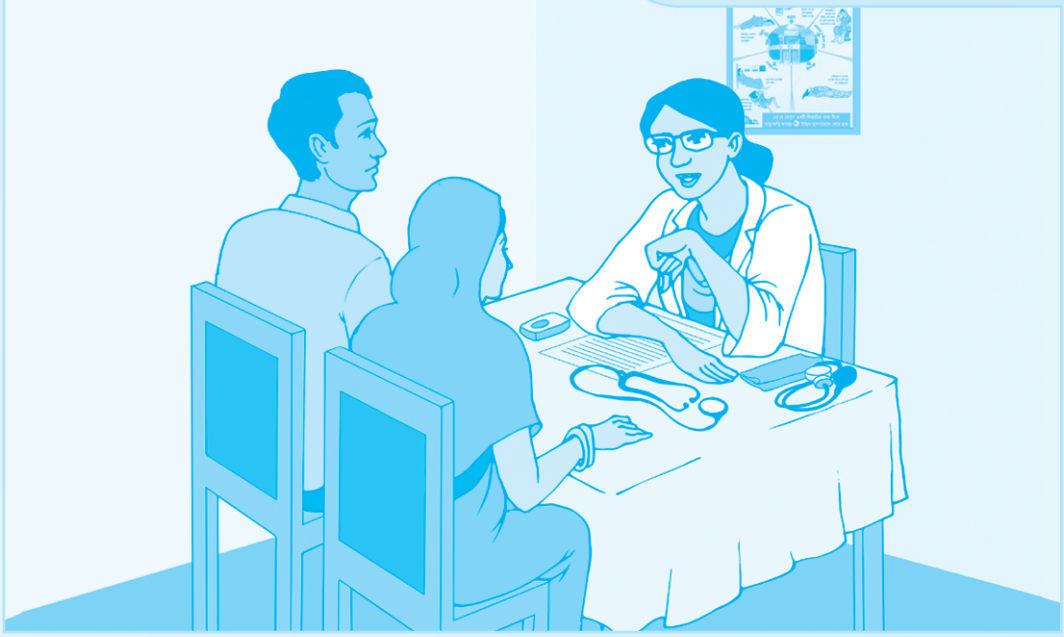

গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা

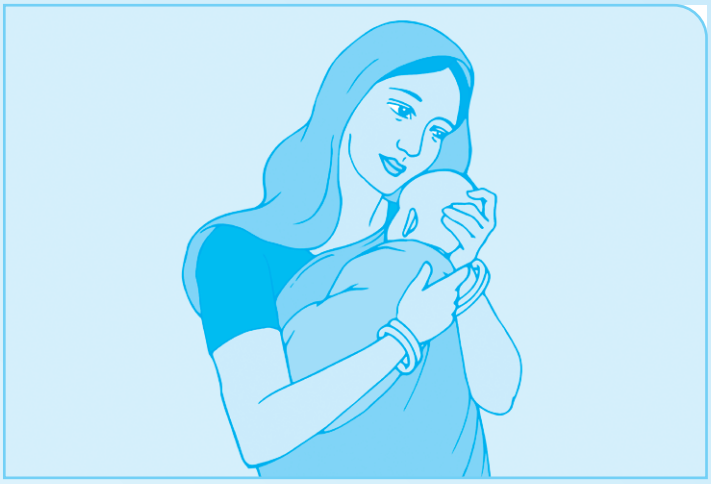

উদ্দেশ্য

- গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যের ওপর এর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া
- গর্ভধারণ-পূর্ব সেবার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা

গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা

মা, নবজাতক এবং শিশুর সু-স্বাস্থ্যের জন্য গর্ভধারণের পূর্বে সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারী ও দম্পতিকে যে পরামর্শ সেবা দেয়া হয় তাকেই গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা হিসেবে আমরা অভিহিত করবো।

সেবা গ্রহণকারী

- প্রত্যেক সন্তান জন্মদানে সক্ষম দম্পতি
- প্রত্যেক প্রজননক্ষম নারী

লক্ষ্য

- গর্ভধারণের আগে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি এই সেবা সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করা।
- প্রত্যেক প্রজননক্ষম নারী যাতে গর্ভধারণের আগে গর্ভধারণ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি পরীক্ষার পাশাপাশি যথাযথ চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা গ্রহণের সুযোগ পান তা নিশ্চিত করা।
- গর্ভধারণের আগে প্রতিটি প্রজননক্ষম নারীকে গর্ভধারণ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধ বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা (বিশেষ করে, খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক শ্রম, স্থূলতা, পরিবারের সমর্থন, আর্থিক অবস্থা) প্রদান করা।

তথ্যসমূহ

- পৃথিবীতে প্রতি বছর ১৩.৫ কোটির বেশি মহিলা সন্তান জন্মদান করে। এদের মধ্যে প্রায় ২ কোটি মহিলা সন্তান জন্মদানের পর গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত অসুস্থতায়, যেমন: জ্বর, রক্তস্বল্পতা, ফিস্টুলা, প্রস্রাব ধরে রাখতে অসুবিধা (ইনকন্টিনেন্স), বন্ধ্যাত্ব এবং বিষণ্নতা ইত্যাদিতে ভুগে থাকে।
- প্রতিদিন প্রায় ৮৩০ জন মহিলা গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের সাথে সম্পর্কিত প্রতিরোধযোগ্য জটিলতায় মারা যায়। এদের মধ্যে ৯৯ শতাংশ মায়ের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই।
- মহিলারা মূলত ৫টি প্রধান কারণে গর্ভাবস্থায় ও সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়। এগুলো হলো- অতিরিক্ত রক্তপাত/রক্তশূন্যতা, জীবাণুঘটিত সংক্রমণ, বিপজ্জনক গর্ভপাত, উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতা (প্রি-একলাম্পশিয়া এবং একলাম্পশিয়া) এবং রোগজনিত জটিলতা (যেমন- হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি)।
- প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৪ জন নারীর গর্ভধারণ অপরিকল্পিত ফলে চল্লিশ শতাংশ দম্পতিই সঠিক সময়ে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে।
- পৃথিবীতে ২০ শতাংশ মায়ের মৃত্যু হয়ে থাকে অপুষ্টি এবং আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতার কারণে।
- বিশ বছরের বেশি বয়সী মায়েদের তুলনায় বিশ বছরের কম বয়সী মায়েদের মধ্যে শিশু মৃত্যুহার ৫০ শতাংশ বেশি।
- স্বল্প উন্নত দেশগুলিতে মাত্র ৫১ শতাংশ মহিলা সুপ্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবা লাভ করে।

বাংলাদেশে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার চিত্র

বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল ২০১৪-এর তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে

- প্রায় ৫০ শতাংশ গর্ভধারণ অপরিকল্পিত এবং ২৫ শতাংশ অবাঞ্ছিত।

- প্রায় ৭৫ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা প্রসব-পূর্ব সেবা থেকে বঞ্চিত।
- শহরে ৫৮ শতাংশ ও গ্রামীণ এলাকায় ২৩ শতাংশ মহিলা সুপ্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে প্রসব-পূর্ব সেবা লাভ করে।
- প্রতি এক হাজার জনসংখ্যায় শিশু জন্মহার ২১.৬১।
- গড় সন্তান জন্মহার ২.৪৫।
- প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে মৃত্যুহার ৪৫.৬৭।
- জন্মত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্মহার ২.৪ শতাংশ।
- কম ওজনের শিশুর জন্মহার ৪০ শতাংশ।

গর্ভধারণ-পূর্ব সেবার ইতিবাচক প্রভাব

- অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ প্রতিরোধ করে।
- গর্ভকালীন এবং প্রসবকালীন জটিলতা প্রতিরোধ করে ।
- মায়ের অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার কমায়।
- অকালে সন্তান প্রসব এবং কম ওজনের শিশুর জন্ম প্রতিরোধ করে।
- শিশুর জন্মত্রুটি এবং জন্ম পরবর্তী রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।
- ভবিষ্যত টাইপ-২ ডায়াবেটিস, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

গর্ভধারণ-পূর্ব সেবার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো

- পরিবার পরিকল্পনা ও প্রতিটি গর্ভধারণের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা।
- শারীরিক শ্রম ও ব্যায়ামের অভ্যাস তৈরি করা ।
- পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণে আগ্রহী করা।
- গর্ভধারণের পূর্বে ওজন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করা।
- তামাক, অ্যালকোহল এবং নিষিদ্ধ ঔষধ খাওয়া থেকে বিরত রাখা।
- ভিটামিন, আয়রন এবং ফলিক এসিড খাওয়ার পরামর্শ দেয়া।
- অপুষ্টি/ওজনাধিক্য ও স্থুলতা, রক্তস্বল্পতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মূত্রনালির সংক্রমণ, যৌনবাহিত সংক্রমণ ইত্যাদি সনাক্ত ও এর প্রতিকার করা।
- আগে থেকে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তস্বল্পতা, প্রস্রাবে সংক্রমণ, হাঁপানি, খিঁচুনি, যক্ষা, থাইরয়েড রোগ ও পেটের রোগে আক্রান্ত থাকলে ভালভাবে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা।

যে বিষয়গুলো মূল্যায়ণ করা হবে

বিষয়সমূহ	*নির্ণয়ের কারণ*
রক্তের গ্রুপ	নেগেটিভ গ্রুপের নারীদের সনাক্তকরণ
হিমোগ্লোবিন	রক্তস্বল্পতা দেখা
রক্তে গ্লুকোজ পরীক্ষা	ডায়াবেটিস এবং প্রি-ডায়াবেটিস সনাক্তকরণ
প্রস্রাব পরীক্ষা	প্রস্রাবে আমিষের উপস্থিতি এবং মূত্রনালির সংক্রমণ দেখা
শরীরের মাপ যেমন- ওজন, উচ্চতা, কোমরের মাপ, নিতম্বের মাপ	পুষ্টিহীনতা, ওজনাধিক্য/ স্থূলতা দেখা
রক্তচাপ মাপা	উচ্চ রক্তচাপ সনাক্তকরণ

সকল গর্ভধারণই হোক পরিকল্পিত
গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা প্রকল্প, নাজাস

মডিউল ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবার পরিকল্পনা

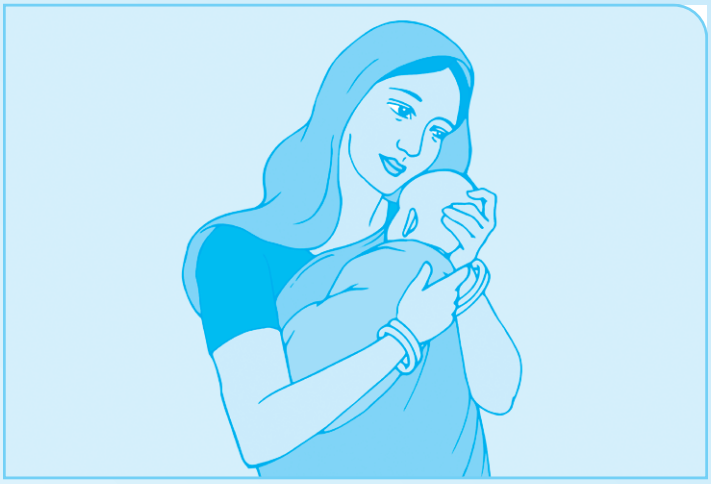

উদ্দেশ্য

- পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা দেয়া

পরিবার পরিকল্পনা

সঠিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে পরিবারে সন্তানদের সংখ্যা এবং তাদের জন্মদানের মধ্যে ব্যবধান নিয়ন্ত্রণ করার নামই পরিবার পরিকল্পনা।

তথ্যসমূহ

- বর্তমানে বিশ্বে, ৬৪ শতাংশ প্রজননক্ষম নারী (১৫-৪৯ বছর) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং এদের মধ্যে ৫৭ শতাংশ আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।
- বাংলাদেশের ৬৪.২ শতাংশ প্রজননক্ষম বিবাহিত নারী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং এদের মধ্যে ৫৭.৬ শতাংশ আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা

১. মায়ের জীবন ও প্রসবকালীন স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

২. মায়ের অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার কমায়।

৩. নবজাতকের স্বাস্থ্য উন্নত করে।

৪. অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ প্রতিরোধ করে।

৫. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (যেমন- কনডম) ব্যবহারের মাধ্যমে এইচআইভি / এইডস এবং অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ সংক্রমণ রোধ করা যায়।

৬. কৈশোরে গর্ভধারণ প্রতিরোধ করে, ফলে অকালে সন্তান প্রসব অথবা কম ওজনের শিশুর জন্ম প্রতিরোধ করে ।

৭. পরিকল্পিতভাবে নিজের ইচ্ছামতো সময়ে স্বামী-স্ত্রী পরিবার গঠন করতে পারে।

৮. জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দ্রুত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যায়।

কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে বাধাসমূহ

- সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি
- পদ্ধতি পছন্দে সীমাবদ্ধতা
- সীমিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
- পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ভয়
- লিঙ্গ-ভিত্তিক বাধা

বিভিন্ন ধরনের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে মুখে খাবার বড়ি (ওসিপি) এবং কনডম সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত, বিশেষ করে, নবদম্পতিদের মধ্যে।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. আধুনিক পদ্ধতি

স্থায়ী	অস্থায়ী	
	(দীর্ঘমেয়াদি)	(স্বল্পমেয়াদি)
পুরুষদের জন্য এনএসভি (ভ্যাসেকটমি)। মহিলাদের জন্য টিউবেকটমি (লাইগেশন)।	ইমপ্লান্ট, আইইউডি	খাবার বড়ি, কনডম ইনজেকশন

২. সনাতন পদ্ধতি

- ক্যালেন্ডার পদ্ধতি
- প্রত্যাহার পদ্ধতি

বিশেষ অবস্থায় পরিবার পরিকল্পনা

- উচ্চ রক্তচাপ : জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ও মাসিক ইনজেকশন এড়াতে হবে
- ডায়াবেটিস : সব ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে
- স্তনদানকারী মা : জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ও মাসিক ইনজেকশন এড়াতে হবে
- হার্ট, রক্তনালি, লিভারের গুরুতর রোগ বা স্তন ক্যান্সার : সম্মিলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি, ইনজেকশন, ইমপ্ল্যান্ট এড়াতে হবে

মডিউল ১

তৃতীয় অধ্যায়

বাল্যবিবাহ ও জন্মব্যবধান

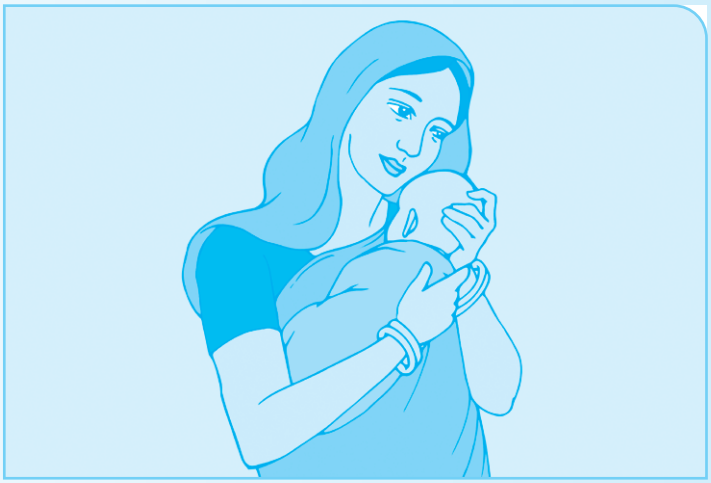

উদ্দেশ্য

- বাল্যবিবাহ ও অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের কারণে মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্বন্ধে অবহিত করা
- জন্ম ব্যবধান সম্পর্কে জানানো

বাল্যবিবাহ

আমাদের দেশে অধিকাংশ মেয়েরই অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। অল্প বয়সে বিয়ের কারণে তাদের অনেকে কৈশোরেই গর্ভধারণ করে। একটি কিশোরীর শরীর বা মন কোনটাই তখন মা হবার জন্য উপযুক্ত নয় বলে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। কারণ এ বয়সে মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি ও গঠন সম্পূর্ণ হয় না। এ ছাড়া অপরিণত বয়সের একটি মেয়ের সন্তানধারণ ও জন্মদান সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণাও থাকে না। গর্ভধারণ করলে শুধু যে মেয়েটি শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা না, সদ্যোজাত শিশুটির জীবনও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

তথ্যসমূহ

- বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে থাকে।
- বাংলাদেশে অপ্রাপ্তবয়সী মেয়েদের গর্ভধারণের হার প্রতি ১০০০ জনে ৮৯ জন।
- প্রসবকালীন মৃত্যুহার প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের তুলনায় কিশোরীদের ৫ গুণ বেশি।

জটিলতা

- প্রাপ্তবয়স্ক মায়ের চেয়ে কিশোরী মায়েদের প্রসবকালীন জটিলতার আশঙ্কাও বেশি থাকে।
- মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস, গর্ভকালীন সংক্রমণ, রক্তস্বল্পতা এবং সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্যে গর্ভে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকার কারণে কম ওজনের শিশু জন্ম নেয় ফলে এইসব শিশুর ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিও বেড়ে যায়। এ ছাড়া মা ও সন্তানের মৃত্যু ঝুঁকিও বেড়ে যায়।
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, শরীরে পানি আসা, প্রচন্ড মাথাব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, গর্ভপাত ইত্যাদি ঘটে থাকে। অনেক সময় গর্ভে পূর্ণতা লাভের আগেই সন্তানের জন্ম হয় এবং জন্ম থেকেই নানা রকমের শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এসব শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম থাকে।
- গর্ভপাত হলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভপাত ঘটালে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রসূতিদের অনেকের জ্বর, খিঁচুনি, রক্তক্ষরণ প্রভৃতির কারণে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

প্রতিরোধ

- মেয়েরা ১৮ বছর এবং ছেলেরা ২১ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে বিয়ে করা উচিত নয়; কারণ তা আইনের চোখে অপরাধ এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ঝুঁকিপূর্ণ।
- কোনো কারণে যদি এ বয়সের আগে বিয়ে হয়েই যায় তবে অবশ্যই ডাক্তার বা স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনাকর্মীর পরামর্শ মতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অবশ্যই গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় ও প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণ করতে হবে।
- আমাদের দেশে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ এই অল্প বয়সে অর্থাৎ কৈশোরে বিয়ে ও গর্ভধারণ। কাজেই আইন মেনে অপরিণত বয়সে ছেলেমেয়ের বিয়ে প্রতিরোধ করতে পারলে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের কোনো সুযোগ থাকবে না।

- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণে যে সব জটিলতার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে হবে।

জন্ম ব্যবধান

অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে ও সন্তান ধারণের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অনেক মা মৃত্যুবরণ করেন। ঘন ঘন সন্তান নিলে মা ও শিশুর জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ে। এই ঝুঁকি কমানোর জন্য সন্তান জন্মদানের মধ্যে বিরতি দিতে হবে। দুটি সন্তান জন্মদানের মধ্যে ব্যবধান কমপক্ষে ২ বছর হলে মায়ের প্রজনন স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং শিশু স্বাস্থ্যবান ও রোগমুক্ত থাকবে। ঘনঘন গর্ভধারণ মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। মেয়েরা পরিণত বয়সে অর্থাৎ ২০ বছরের পর গর্ভধারণ করলে প্রসুতি মায়ের ও শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি কম হবে।

উপকারিতা

- মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য উন্নত করে
- শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখে
- সঠিকভাবে ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানোর সুযোগ পাওয়া যায়
- শিশুর সঠিক যত্ন নেয়া সম্ভব হয়
- আর্থিক স্বচ্ছলতা রক্ষা করে
- পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হয়

মডিউল ১

চতুর্থ অধ্যায়

রক্তের গ্রুপ

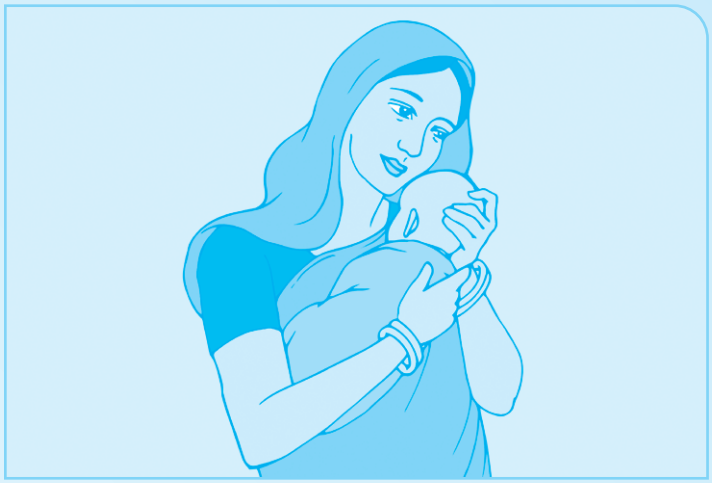

উদ্দেশ্য

- গর্ভাবস্থায় রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া
- গর্ভাবস্থায় রক্তের গ্রুপিং-এর সাথে সম্পর্কিত শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা করা

রক্তের গ্রুপের প্রকারভেদ

প্রতিটি ব্যক্তির একটি রক্তের গ্রুপ (এ, বি, ও, এবি) এবং রেসাস (Rh) ফ্যাক্টর আছে (পজিটিভ বা নেগেটিভ)।

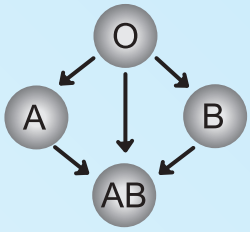

রক্তের গ্রুপ	এ	বি	ও	এবি
রেসাস (Rh) পজিটিভ	এ+	বি+	ও+	এবি+
রেসাস (Rh) নেগেটিভ	এ-	বি-	ও-	এবি-

গর্ভাবস্থায় রেসাস ফ্যাক্টর / রক্তের গ্রুপের গুরুত্ব

গর্ভাবস্থায় রক্তের গ্রুপ ও রেসাস ফ্যাক্টর জানাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মা নেগেটিভ এবং গর্ভস্থ সন্তান পজিটিভ রক্তের গ্রুপের হওয়ার ফলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এটিকে রক্তের গ্রুপের অসঙ্গতি (blood group incompatibility) বলা হয়। সাধারণত প্রথম গর্ভাবস্থায় এ সমস্যা দেখা না গেলেও পরবর্তী গর্ভাধারণের সময়ে রক্তের গ্রুপের এই অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় রক্তের গ্রুপের অসঙ্গতির ফলে সৃষ্ট সমস্যা

মায়ের শরীরের রেসাস নেগেটিভ রক্তের অ্যান্টিবডি প্লাসেন্টা বা গর্ভফুলের মাধ্যমে সন্তানের রেসাস পজিটিভ রক্তে প্রবেশ করে সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন:

- রক্তের লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস করে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া তৈরি করে
- রক্তে বিলিরুবিন বেড়ে গিয়ে শিশুদের জন্ডিস ও মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি করে
- এমনকি অতিরিক্ত হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার কারণে গর্ভস্থ শিশুর এবং নবজাতকের অসুস্থতা ও মৃত্যুঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এছাড়াও হার্ট ফেইলর এবং হাইড্রোপস ফিটালিসের মত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে

গর্ভাবস্থার পূর্বে এবং গর্ভকালীন যে কোনো জরুরি অবস্থায় (যেমন- অতিরিক্ত রক্তস্বল্পতা, প্রসবের পূর্বে ও পরে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ইত্যাদি) মাকে রক্তদানের জন্য মায়ের রক্তের গ্রুপ আগেই জেনে নেয়া আবশ্যক।

করণীয়

- গর্ভধারণের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের রক্তের গ্রুপ রেসাস ফ্যাক্টরসহ (পজিটিভ/ নেগেটিভ) জেনে নিতে হবে।
- নেগেটিভ গ্রুপের সকল গর্ভবতী মহিলাকে রেসাস এন্টিবডি পরীক্ষা করাতে হবে। প্রতিটি রেসাস নেগেটিভ মহিলাকে ২৪-২৮ সপ্তাহের সময় পুনরায় রেসাস এন্টিবডি পরীক্ষা করাতে হবে। রেসাস নেগেটিভ মহিলাদের প্রতিষেধক হিসাবে এন্টি-ডি ইনজেকশন দিতে হবে।

সকল গর্ভধারণই হোক পরিকল্পিত
গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা প্রকল্প, নাজাস

মডিউল ১

পঞ্চম অধ্যায়

গর্ভধারণ-পূর্ব টিকা (ইমুনাইজেশন)

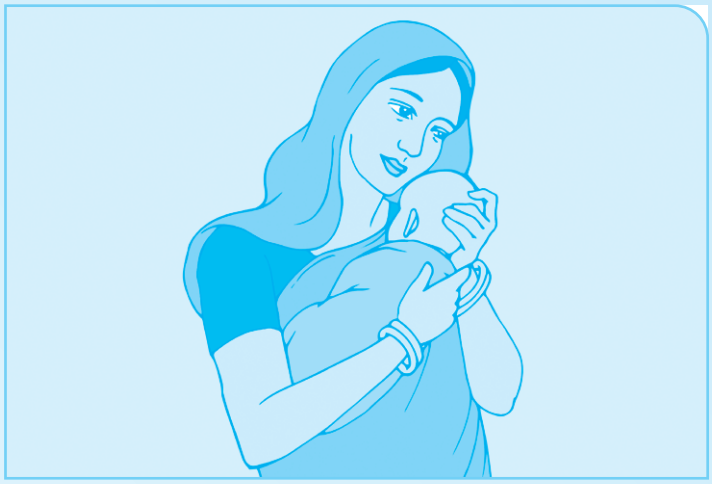

উদ্দেশ্য

- গর্ভধারণের পূর্বে প্রতিষেধক প্রদানের (ইমুনাইজেশন) মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করার গুরুত্ব সম্পর্কিত ধারণা দেয়া

গর্ভধারণ-পূর্ব টিকা (ইমুনাইজেশন)

- টিকার মাধ্যমে শরীরে সংক্রামক জীবাণুর বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে ইমুনাইজেশন বলে।
- গর্ভধারণের পূর্বেই প্রত্যেক নারীকে নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী সকল প্রতিরোধযোগ্য রোগের টিকা নিতে হবে।
- গর্ভধারণের পূর্বে বিশেষ করে- হাম, মাম্পস, রুবেলা (এমএমআর), জলবসন্ত (ভ্যারিসেলা) ও বি-ভাইরাসের টিকা নেয়ার মাধ্যমে এইসব ছোঁয়াচে রোগগুলির মারাত্মক জটিলতা থেকে মা ও গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করা যেতে পারে।
- এছাড়া, গর্ভধারণের আগে প্রত্যেক প্রজননক্ষম নারীকে টিটেনাস (ধনুষ্টংকার) টিকার ৫ টি ডোজ (প্রথম টিকা নেবার ২৮ দিন পরে দ্বিতীয় টিকা, ৬ মাস পরে তৃতীয় টিকা, ১ বছর পরে চতুর্থ টিকা এবং তার ১ বছর পরে পঞ্চম টিকা) নিতে হবে। যদি কেউ টিটেনাস টিকা না দিয়ে থাকেন তাহলে গর্ভাবস্থার ৫ম ও ৬ষ্ঠ মাসে ২টি টিটি টিকা নিতে হবে।

টিকার মাধ্যমে রোগ সংক্রান্ত জটিলতা প্রতিরোধ

প্রত্যেক বিবাহিত নারীকে গর্ভধারণের পূর্বে উল্লেখিত টিকা দেয়া জরুরি, যা প্রতিরোধ করবে-

- মা ও নবজাতকের ধনুষ্টংকার রোগ।
- অবাঞ্ছিত গর্ভপাত।
- শিশুদের মারাত্মক জন্মত্রুটি বিশেষ করে- হৃতপিন্ড, স্নায়ু, চোখ ও কান।
- এছাড়া, জলবসন্তের ফলে মায়ের গুরুতর জটিলতার পাশাপাশি, নবজাতকের অপরিণত শারীরিক গঠন, অপরিণত মস্তিস্কের বৃদ্ধির মত জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে।
- প্রত্যেক বিবাহিত নারীর গর্ভধারণের পূর্বে টিকা নেয়া উচিত এবং এমএমআর ও জলবসন্তের টিকা দেয়ার ৪ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভধারণ না করার জন্য বলা হয়েছে ।

নিচের তথ্যগুলি থেকে সত্য / মিথ্যা খুঁজে বের করুন (১ম থেকে ৫ম অধ্যায় পর্যন্ত)

১) প্রতি ১০ জন নারীর মধ্যে ৪ জনই অপরিকল্পিত গর্ভধারণ করে থাকে।

২) পৃথিবীতে ২০ শতাংশ মায়ের মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি ও আয়রন ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা।

৩) গর্ভধারণের আগে সঠিক সেবা ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

৪) মায়ের সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রতিটি গর্ভধারণের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধান থাকা প্রয়োজন।

৫) প্রজননক্ষম প্রতিটি নারীকে গর্ভধারণ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধ বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন।

৬) প্রত্যেক বিবাহিত নারীর গর্ভধারণের পূর্বে টিকা নেয়া উচিত।

৭) এমএমআর ও জলবসন্তের টিকা দেয়ার ৪ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভধারণ করা উচিত নয়।

৮) গর্ভধারণের পূর্বেই প্রত্যেক মহিলার রক্তের গ্রুপ জেনে নেয়া প্রয়োজন।

৯) নেগেটিভ গ্রুপের সকল গর্ভবতী মহিলাকে রেসাস এন্টিবডি পরীক্ষা করাতে হবে।

১০) সঠিক সময়ে টিকা গ্রহণের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত গর্ভপাত প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সকল গর্ভধারণই হোক পরিকল্পিত
গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা প্রকল্প, নাজাস

মডিউল ২

ষষ্ঠ অধ্যায়

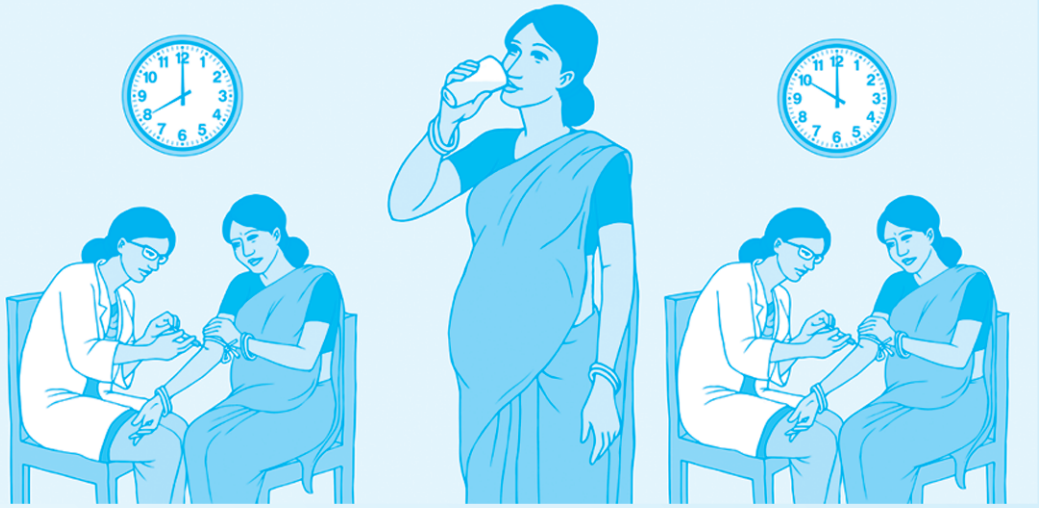

ডায়াবেটিস মেলাইটাস

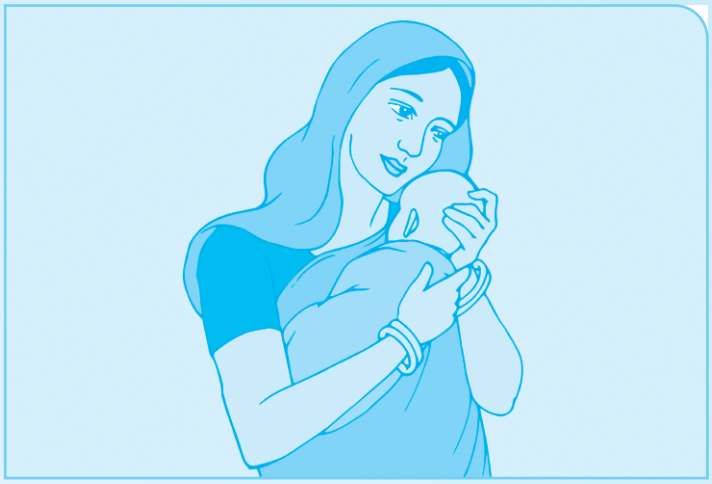

উদ্দেশ্য

- ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা

ডায়াবেটিস মেলাইটাস

এটি একটি বিপাকজনিত সমস্যা, যেখানে রক্তের গ্লুকোজ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায়। বংশগত বা/এবং পারিপার্শ্বিক কারণে ইনসুলিন নামক হরমোনের নিঃসরণ কমে গেলে বা ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা কমে গেলে বা এ দুয়ের মিলিত প্রভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

প্রি-ডায়াবেটিস

রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কিন্তু ডায়াবেটিসের নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম থাকলে তাকে প্রি-ডায়াবেটিস বা ডায়াবেটিসের পূর্বাবস্থা বলে। আইএফজি এবং আইজিটি এই শ্রেণীভুক্ত। পরবর্তী সময়ে এদের ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি অনেক বেশি।

তথ্যসমূহ

- বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৪১.৫ কোটি লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত (৮.৮ শতাংশ), যার মধ্যে অর্ধেক আক্রান্ত ব্যক্তিই তার রোগ সর্ম্পকে অবগত নন।
- বাংলাদেশের প্রায় ৭০ লক্ষেরও বেশি লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত (৮.৩ শতাংশ), যার ৯৫ শতাংশই টাইপ-২ ডায়াবেটিস।
- ২০১৫ সালে ডায়াবেটিসের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন জটিলতায় ৫০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মারা গেছেন, যা মোট মৃত্যুর ১৪.৫ শতাংশ।
- বর্তমান বিশ্বে স্বাস্থ্য বাজেটের ১২ শতাংশ খরচ হয়ে থাকে ডায়াবেটিস চিকিৎসায়।
- যে সব লোক প্রি-ডায়াবেটিস বা ডায়াবেটিসের পূর্বাবস্থায় রয়েছেন তাদের পরবর্তীকালে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ২৫-৩০ শতাংশ।

প্রকারভেদ

ডায়াবেটিস প্রধানত ৪ ধরনের:

- টাইপ-১ ডায়াবেটিস
- টাইপ-২ ডায়াবেটিস
- গর্ভকালীন ডায়াবেটিস
- বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিস

বিষয়	*টাইপ-১ ডায়াবেটিস*	*টাইপ-২ ডায়াবেটিস*	*গর্ভকালীন ডায়াবেটিস*
বয়স	৩০ বছরের কম	৩০ বছর বা তার বেশি	গর্ভবতী মহিলা
ওজন	সাধারণত ক্ষীণকায়	সাধারণত স্বাভাবিক বা মোটা	নির্দিষ্ট নয়
সনাক্তের সময়	হঠাৎ করে	ধীরে ধীরে (১০-১৫ বছর)	গর্ভকালীন
ঝুঁকিসমূহ	অটো-ইমিউন, বিশেষ কিছু ভাইরাস ও পরিবেশগত কারণ এটাকে ত্বরান্বিত করে	বংশগত ও পরিবেশগত কারণ, গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের ইতিহাস, বিশেষ জাতিসত্তার মানুষ ইত্যাদি	বংশগত ও পরিবেশগত কারণ, গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের ইতিহাস, বিশেষ জাতিসত্তার মানুষ ইত্যাদি
ইনসুলিন নিঃসরণ/কার্যক্ষমতা	ইনসুলিন নিঃসরণ একদম হয় না	ইনসুলিন প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকে অথবা ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা কমে যায়	ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা কমে যায়
রক্তে গুকোজের মাত্রা	সাধারণত অনেক বেশি	মাঝারি থেকে বেশি	নির্দিষ্ট নয়
প্রস্রাবে কিটোন	সাধারণত পাওয়া যায়	সাধারণত পাওয়া যায় না	নির্দিষ্ট নয়
চিকিৎসা	ইনসুলিন ও জীবনযাপনে শৃঙ্খলা ও পরিবর্তন	জীবনযাপনে শৃঙ্খলা ও পরিবর্তন এবং প্রয়োজনে খাওয়ার ওষুধ বা ইনসুলিন	জীবনযাপনে শৃঙ্খলা ও পরিবর্তন এবং প্রয়োজনে ইনসুলিন

সনাক্তকরণ

রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে গ্লুকোজের মাত্রা সনাক্ত করা হয়ে থাকে। পরীক্ষা পদ্ধতি:

১। সকালে খালি পেটে (রাতে খাবারের ৮-১৪ ঘন্টা পর) রক্ত পরীক্ষা

২। ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ ২৫০-৩০০ মিলিলিটার পানিতে মিশিয়ে খাওয়ার ২ ঘন্টা পর রক্ত পরীক্ষা

রক্ত পরীক্ষা	স্বাভাবিক মাত্রা	আইএফজি	আইজিটি	ডায়াবেটিস
খালি পেটে	<৬.১ মিলিমোল/ লিটার	৬.১- <৭.০ মিলিমোল/ লিটার	<৭.০ মিলিমোল/ লিটার	≥৭.০ মিলিমোল/ লিটার
৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার ২ ঘন্টা পর	<৭.৮ মিলিমোল/ লিটার	-	৭.৮- < ১১.১ মিলিমোল/ লিটার	≥১১.১ মিলিমোল/ লিটার

ঝুঁকিসমূহ

- যাদের ওজন স্বাভাবিকের থেকে বেশি (বিএমআই ২৩ বা তার বেশি)
- যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করেন না
- যারা অতিমাত্রায় ফাস্টফুড খান বা কোমল পানীয় পান করেন
- যাদের বংশে বিশেষ করে, বাবা-মা, ভাই-বোনের ডায়াবেটিস আছে
- যাদের প্রি-ডায়াবেটিস আছে
- মহিলাদের মধ্যে যাদের গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস ছিল
- যাদের বেশি ওজনের (৪.১ কেজি বা ৯ পাউন্ডের বেশি) সন্তান প্রসবের ইতিহাস আছে
- যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে

- যাদের রক্তে চর্বির মাত্রা বেশি
- যাদের হৃদরোগের ইতিহাস আছে
- বিশেষ কিছু জাতিসত্তার মানুষ, যেমন- দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার অধিবাসী

উপসর্গ

- বেশি বেশি প্রস্রাব হওয়া
- বেশি বেশি পিপাসা পাওয়া
- বেশি বেশি ক্ষুধা লাগা
- ওজন কমে যাওয়া
- দুর্বল হয়ে যাওয়া
- ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনো উপসর্গ নাও থাকতে পারে

দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা

- কিডনি বিকল হওয়া
- হৃদরোগ
- স্ট্রোক বা পক্ষাঘাত
- অন্ধত্ব
- পায়ে পচনশীল ক্ষত

চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ

- ডায়াবেটিস রোগীকে ডায়াবেটিস-সেবা প্রদানকারীদের অধীনে নিয়মিতভাবে ফলো-আপে থাকতে হবে।

প্রতিরোধ পদ্ধতি

- ঝুঁকিযুক্ত (প্রি-ডায়াবেটিস আক্রান্ত) মানুষদের খুঁজে বের করা
- ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় করা (বয়স, বিএমআই, কোমরের মাপ, কর্মক্ষমতা, পারিবারিক ইতিহাস অনুসারে)
- জীবন-যাপনে শৃঙ্খলা ও পরিবর্তন। যেমন-
  - ওজন নিয়ন্ত্রণ করা
  - পরিকল্পিত খাদ্য ব্যবস্থা
  - নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম
  - ধুমপান বন্ধ করা
  - চাপমুক্ত থাকতে চেষ্টা করা
- বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ঔষধ সেবন করা

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ

- ক্যালরিবহুল ও চর্বিযুক্ত খাবার বিশেষত, স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেমন- ঘি, মাখন, ডালডা, মাংস, ফাস্টফুড ইত্যাদি কম খাওয়া, পরিবর্তে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট যেমন- উদ্ভিজ্জ তেল (ক্যানোলা তেল, সয়াবিন তেল, সূর্যমুখী তেল ইত্যাদি) এবং সব ধরনের মাছ খাওয়ার অভ্যাস করা।
- শর্করাবহুল খাবারগুলো (চাল, আটা দিয়ে তৈরি খাবার, মিষ্টি ফল) কিছুটা হিসেব করে খাওয়া।
- আঁশবহুল খাবার (ডাল, শাকসব্জি, টক ফল ইত্যাদি) বেশি খাওয়া।
- চিনি-মিষ্টি জাতীয় খাবার বাদ দেয়া।
- রান্নার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা, অর্থাৎ বেশি তেলে ভাজা বা ডিপ ফ্রাই-এর পরিবর্তে গ্রিল, সিদ্ধ বা ঝোল রেখে রান্না করা।

শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম

সাধ্যমত কায়িক পরিশ্রম বাড়াতে হবে, বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় প্রমাণিত যে প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে ১৫০ মিনিট দ্রুতভাবে হাঁটলে ৪০-৫০ ভাগ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব। এক সাথে ৩০ মিনিট সময় না পেলে ১০ মিনিট করে দিনে তিনবার হাঁটা যায়।

ওজন কমানো

ওজন স্বাভাবিক মাত্রায় থাকলে সেটা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক। শরীরের ওজন বেশি থাকলে নুন্যতম ৫-১০ শতাংশ ওজন কমাতে হবে যা ডায়াবেটিস প্রতিরোধের পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করবে।

ধূমপান ও তামাক সেবন বন্ধ

কিছুতেই ধূমপান বা তামাক সেবন করা উচিৎ নয়। কেননা ধুমপান যুক্ত হলে রোগের জটিলতা এবং রোগের ভয়াবহতা অনেক গুণ বেড়ে যায়। শুধুমাত্র তামাক (ধুমপান ও জর্দা) এড়ানোর মাধ্যমেও ডায়াবেটিসের জটিলতা প্রায় ৩০ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব।

ঔষধ

সকল প্রি-ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিকেই খাদ্যব্যবস্থা, ব্যায়াম ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যব্যবস্থা ও নিয়মিত ব্যায়ামের পাশাপাশি বিশেষ কিছু ঔষধ বিশেষত, মেটফরমিন, একারবোস জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করেও ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সুফল পাওয়া গেছে।

মডিউল ২

সপ্তম অধ্যায়

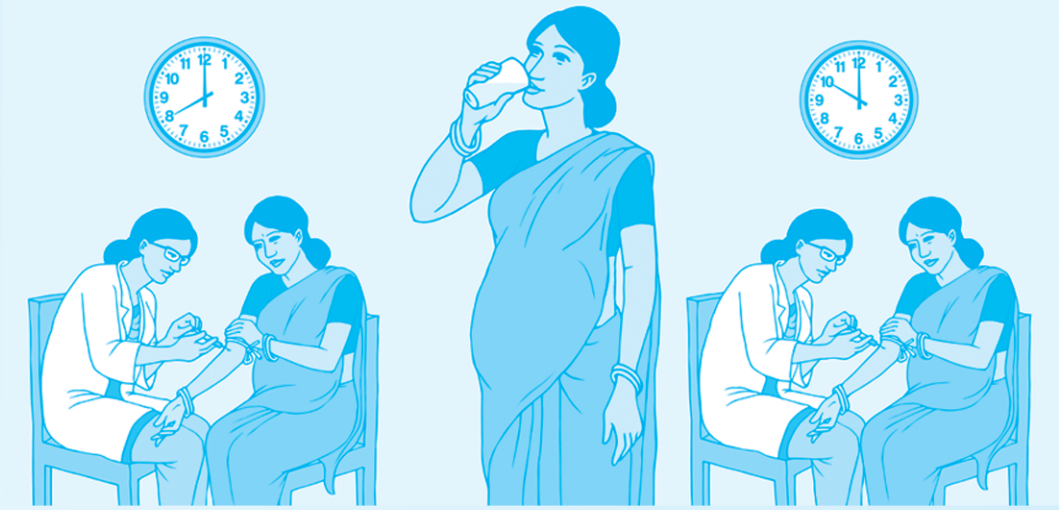

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস (জিডিএম)

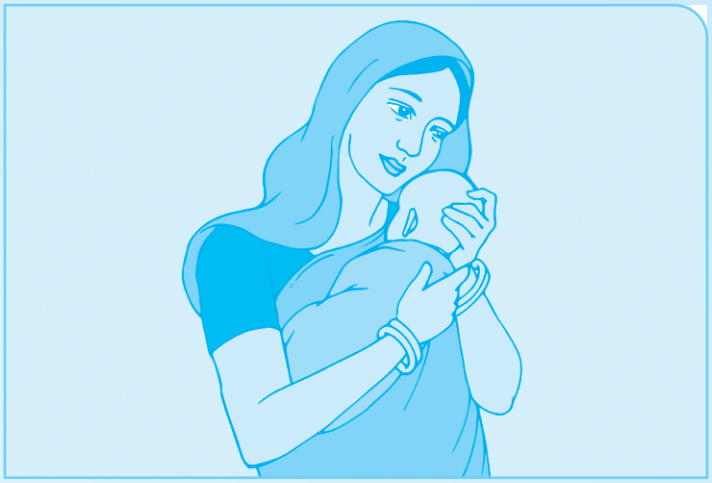

উদ্দেশ্য

- গর্ভকালীন ডায়াবেটিস সম্পর্কে আলোকপাত করা

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

গর্ভধারণের পর যদি রক্তের গ্লুকোজ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পাওয়া যায় তবে সে অবস্থাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বলে। এ সময়ে ডায়াবেটিস খুব ভালভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা মা এবং গর্ভস্থ শিশুর সুস্থ বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসমূহ

- বর্তমান বিশ্বে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্তের হার ১-২৮ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার মহিলাদের মধ্যে এ হার সবচেয়ে বেশি (২৫ শতাংশ)।
- বর্তমানে বাংলাদেশে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস আক্রান্তের হার ৬-১৪ শতাংশ।
- গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে ৬৫ শতাংশের পরবর্তী গর্ভধারণের সময়ে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস দেখা দেয়।
- যে সব মহিলার গর্ভকালীন ডায়াবেটিস দেখা যায় তাদের পরবর্তীকালে টাইপ-২ ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি অনেক বেশি (প্রতি ১০ বছরে প্রায় ৫০ শতাংশ)।
- যে সব মায়ের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ছিল তাদের শিশুদেরও পরবর্তী সময়ে টাইপ-২ ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি অনেক বেশি।

ঝুঁকিসমূহ

- বয়স ২৫ বছর বা বেশি
- পরিবারের অন্য কারোর ডায়াবেটিস থাকলে
- ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি (বিএমআই ২৩ বা তার বেশি)
- যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করেন না
- আগের গর্ভধারণের সময় বিশেষ কিছু জটিলতা যেমন- গর্ভপাত, বড় বাচ্চা বা মৃত বাচ্চা প্রসবের ইতিহাস থাকলে
- আগে জিডিএম, আইএফজি বা আইজিটির ইতিহাস থাকলে

সনাক্তকরণ

- যাদের ঝুঁকি বেশি তাদের গর্ভধারণের ১২-১৪ সপ্তাহে, অথবা তারও আগে একবার রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে এবং তখন ডায়াবেটিস ধরা না পড়লে গর্ভধারণের ২৪-২৮ সপ্তাহে আবার রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।
- যাদের ঝুঁকি কম তাদের গর্ভধারণের ২৪-২৮ সপ্তাহে পরীক্ষা করালেই হবে।
- সকালে খালি পেটে (রাতে খাওয়ার ৮-১৪ ঘন্টা পর) এবং ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ ২৫০-৩০০ মিলিলিটার পানিতে মিশিয়ে খাওয়ার ২ ঘন্টা পর রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে
    - খালি পেটে: ৫.১ মিলিমোল/লিটার ও তার বেশি
    - ২ ঘন্টা পর: ৮.৫ মিলিমোল/লিটার ও তার বেশি

নিয়ন্ত্রণের আদর্শ মাত্রা

- খালি পেটে (সকাল, দুপুর, রাতের খাবার আগে): ৫.৩ মিলিমোল/ লিটার
- খাওয়ার ২ ঘন্টা পর (সকাল, দুপুর, রাতের খাবার পর): ৬.৭ মিলিমোল/ লিটার
- রক্তচাপ: ১৩০/৮০ নিচে

জটিলতা

১. মায়ের জটিলতা

- গর্ভপাত বা অ্যাবোরশন
- গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু
- প্রি-এক্লাম্পশিয়া, এক্লাম্পশিয়া (খিঁচুনি)
- জরায়ুতে পানি বেড়ে যাওয়া
- সময়ের আগে সন্তান প্রসব

২. শিশুর জটিলতা

ক. গর্ভস্থ শিশুর সমস্যা

- জন্মগত ত্রুটি- যেমন হৃদরোগ, বিকলাঙ্গ
- অত্যন্ত কম বা বেশি ওজনের শিশু
- অপরিণত শিশুর জন্ম

খ. জন্ম পরবর্তী সমস্যা

- হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তের গ্লুকোজ অত্যধিক কমে যাওয়া
- জন্ডিস, শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি ইত্যাদি

করণীয়

- পরিমাণমত সুষম খাবার খাওয়া।
- হালকা ব্যায়াম করা।
- গর্ভধারণের আগে এবং গর্ভকালীন অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা।
- নিয়মিত রক্তচাপ ও রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করা।
- প্রয়োজনে নিয়ম অনুযায়ী ইনসুলিন গ্রহণ করা।
- প্রসবের ৬ সপ্তাহ পর আবার রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করে ডায়াবেটিস আছে কিনা নিশ্চিত হওয়া।
- গর্ভকালীন ডায়াবেটিস পরবর্তীকালে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে, তাই তাদেরকে নিয়মিত পরীক্ষা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নিচের তথ্যগুলি থেকে সত্য/মিথ্যা খুঁজে বের করুন (৬ষ্ঠ থেকে ৭ম অধ্যায় পর্যন্ত)

১) গর্ভবতী অবস্থায় প্রথমবারের মত ডায়াবেটিস ধরা পড়লে তাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বলে।

২) যাদের উচ্চ রক্তচাপ, ওজনাধিক্য ও বংশে ডায়াবেটিস আছে, তাদের ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি বেশি।

৩) ঘন ঘন ক্ষুধা, পিপাসা ও প্রস্রাব হওয়া এবং ওজন কমে যাওয়া ও দুর্বল লাগা এ সবই ডায়াবেটিসের উপসর্গ।

৪) ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় করে জীবন যাত্রায় শৃঙ্খলা ও পরিবর্তন এনে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৫) অনিয়ন্ত্রিত গর্ভকালীন ডায়াবেটিস মা ও শিশুর নানান জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

সকল গর্ভধারণই হোক পরিকল্পিত
গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা প্রকল্প, বাঘাস

মডিউল ২

অষ্টম অধ্যায়

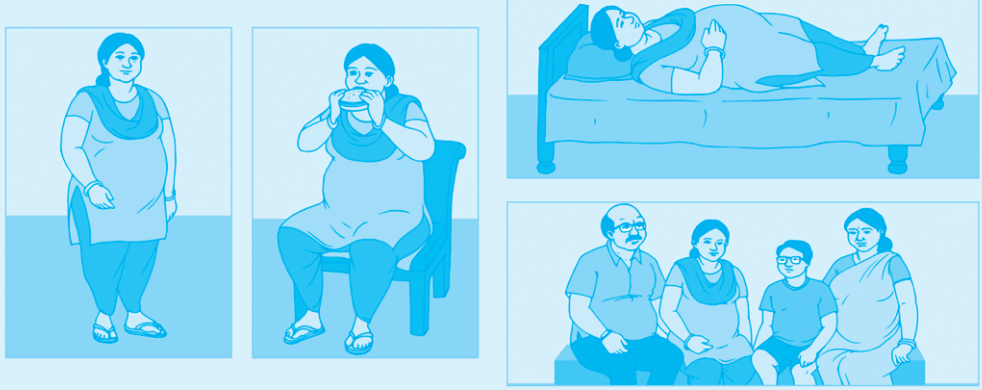

স্থূলতা

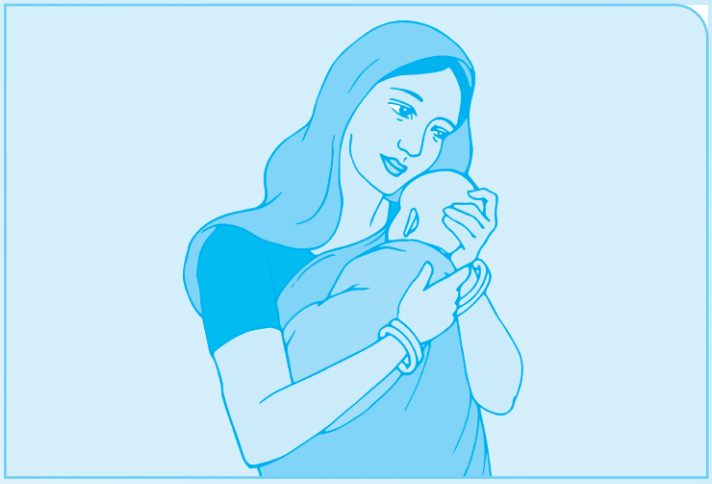

উদ্দেশ্য

- স্থূলতা, স্থূলতার শ্রেণীবিন্যাস ও প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করা
- গর্ভকালীন স্থূলতার ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা করা

ওজনাধিক্য ও স্থূলতা

শরীরে স্বাভাবিকের তুলনায় অতিরিক্ত মেদ বা চর্বি জমা হওয়াকে স্থূলতা বলা হয়। কোনো ব্যক্তির বিএমআই (শরীরের ওজন, উচ্চতা ও স্বাস্থের মধ্যবর্তী সম্পর্কের নির্দেশক) যদি ২৩ এবং ২৫-এর মধ্যে হয়ে থাকে তখন তাকে ওজনাধিক্য (over weight) এবং বিএমআই ২৫ বা এর বেশি হয় তাকে স্থূল (obese) বলা হয়।

তথ্যসমূহ

- বর্তমান বিশ্বের ১.৯ বিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ওজনাধিক্যে আক্রান্ত। এর মধ্যে, ৬০০ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ স্থূলকায়।
- বর্তমান বিশ্বের ৩৯ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ওজনাধিক্যে ও ১৩ শতাংশ (১১ শতাংশ পুরুষ ও ১৫ শতাংশ মহিলা) স্থূলতায় আক্রান্ত।
- ওজনহীনতার (ক্ষীণকায়) তুলনায় ওজনাধিক্য ও স্থূলতার কারণে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকে।
- বাংলাদেশে ১৮.১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক (১৫ শতাংশ পুরুষ এবং ২১.৩ শতাংশ মহিলা) ওজনাধিক্যে এবং ৩.৬ শতাংশ (২.৭ শতাংশ পুরুষ এবং ৫.১ শতাংশ মহিলা) স্থূলতায় আক্রান্ত।
- বাংলাদেশে প্রতি ৫ জন বিবাহিত নারীর মধ্যে ১ জন ওজনাধিক্যে আক্রান্ত, গ্রামের তুলনায় শহরে এর ব্যাপকতা বেশি।
- স্থূল হলে অসংক্রামক রোগে (বিশেষত টাইপ-২ ডায়াবেটিস, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ) আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি।
- প্রতি ২-৩ কেজি ওজন বৃদ্ধিতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ, হৃদরোগের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ ও আর্থ্রাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা ৯-১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

কারণসমূহ

পরিবর্তনযোগ্য কারণসমূহ	*অপরিবর্তনযোগ্য কারণসমূহ*
অতিরিক্ত খাদ্যাভাস (বিশেষত চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া ও কোমল পানীয় পান)	বয়স
ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম না করা	জেনেটিক বা বংশগত
মানসিক সমস্যা	জেনেটিক বা বংশগত
এন্ডোক্রাইন/ হরমোনজনিত সমস্যা (হাইপোথাইরয়ডিজম, কুশিং সিন্ড্রোম ইত্যাদি)	
দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ, জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি, মানসিক রোগে ব্যবহৃত ওষুধ সেবন	

স্থূলতার প্রকারভেদ

চর্বির পরিমাপ অনুসারে

১. সেন্ট্রাল বা পেটের মধ্যভাগের স্থূলতা। একে আপেল আকৃতির স্থূলতা বলে (অধিক ঝুঁকিপূর্ণ) অভিহিত করা হয়

২. জেনারেলাইজড স্থূলতা বা নাশপতি আকৃতির স্থূলতা (কম ঝুঁকিপূর্ণ)

শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় পেটে জমাকৃত চর্বি (Central adeposity) অনেক বেশি বিপজ্জনক। এর মাধ্যমে হৃদরোগের ঝুঁকির পাশাপাশি ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও নির্ণয় করা যায়।

চর্বির বিতরণের ওপর শরীরের আকারকে আপেল আকৃতি বা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এবং নাশপাতি আকৃতি বা কম ঝুঁকিপূর্ণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

আপেল আকৃতি (অধিক ঝুঁকিপূর্ণ)

নাশপাতি আকৃতি (কম ঝুঁকিপূণ)

ওজনাধিক্য/স্থূলতা নিরূপণ

ওজনাধিক্য ও স্থূলতা নিরূপণের সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো বিএমআই (বডি মাস ইন্ডেক্স)। এর জন্য কিলোগ্রামে শরীরের ওজন নিয়ে মিটারে শরীরের উচ্চতা দিয়ে দু'বার ভাগ করতে হয়। বয়স ও লিঙ্গের ভিত্তিতে এর মানের তারতম্য ঘটে না।

বিএমআই = ওজন (কেজিতে) / উচ্চতা^{২} (মিটারে)

বর্তমানে বিএমআই-এর পাশাপাশি কোমর ও নিতম্বের মাপের অনুপাত এমনকি শুধুমাত্র কোমরের মাপ দিয়ে ওজনাধিক্য/স্থূলতা নিরূপণ করা হয় এবং পাশাপাশি পেট ও নিতম্বের চর্বির পরিমাণ নির্ণয়ের সূচক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

শ্রেণী	বিএমআই (কেজি/মি^{২})	কোমরের মাপ (সে.মি.)	কোমর ও নিতম্বের অনুপাত
স্বাভাবিকের কম	১৮.৫ এর কম		
স্বাভাবিক	১৮.৫-২২.৯		
ওজনাধিক্য	২৩-২৪.৯		
স্থূলতা	২৫ বা বেশি	৯০ বা এর বেশি (পুরুষ) ৮০ বা এর বেশি (মহিলা)	০.৯০ বা এর বেশি (পুরুষ) ০.৮০ বা এর বেশি (মহিলা)

স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

টাইপ-২ ডায়াবেটিস
শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ
গল-ব্ল্যাডারে পাথর
হাঁটুর বাত
ঘুমের অসুবিধা

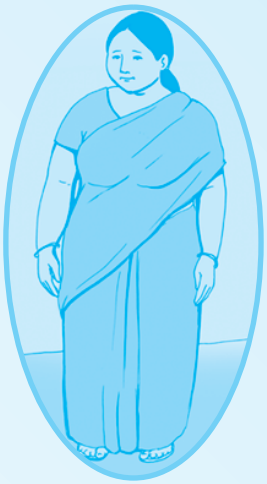

স্ট্রোক
হৃদরোগ
হরমোনজনিত জটিলতা
ক্যান্সার
গাউট্ / গেঁটে বাত

স্থূলতা ও মাতৃত্ব

মাতৃত্বকালে স্থূলতা নিচের ঝুঁকিগুলো বাড়িয়ে তোলে

মায়ের ঝুঁকিসমূহ	*শিশুর ঝুঁকিসমূহ*
গর্ভপাত	জন্মগত ত্রুটি
গর্ভকালীন ডায়াবেটিস	সময়ের আগে সন্তান প্রসব
প্রি-এক্লাম্পশিয়া, এক্লাম্পশিয়া (খিঁচুনি)	স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ওজনের শিশুর জন্ম (৪ কেজির বেশি)
সিজারিয়ান ডেলিভারি	মৃত শিশুর জন্ম হওয়া
রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া	
ভবিষ্যতে মা ও শিশুর টাইপ-২ ডায়াবেটিস	

চিকিৎসা

- বিএমআই ২৫ কেজি/মি^{২} বা বেশি = খাবার, ব্যায়াম ও অভ্যাসে পরিবর্তন
- বিএমআই ৩০ কেজি/মি^{২} বা বেশি = ওষুধ
- বিএমআই ৪০ কেজি/মি^{২} বা বেশি = সার্জারি

প্রতিরোধ

ব্যক্তি পর্যায়ে

- বেশি করে ক্যালরিবিহীন ও আঁশযুক্ত (যেমন- সালাদ, সবজি) খাবার খান। বেশি করে শাকসব্জি ও ফলমূল খান।
- খাবারের টেবিলে রকমারি খাবারের উপস্থিতি কমান।
- বর্জন করুন: ফাস্টফুড, কোমল পানীয়, ভাজা খাবার, তৈলাক্ত খাবার, দুই খাবারের মধ্যবর্তীকালীন খাবার।
- খাবারের শেষে মিষ্টি খাবার খাবেন না। চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার পরিহার করুন।
- বেশি মাছ খান, চামড়াবিহীন মুরগী খাওয়া ও লাল মাংস কম খাওয়ার অভ্যাস করুন।
- ডিম ভাজি বা পোচ বাদ দিয়ে সিদ্ধ ডিম খান। একটা ডিমের বদলে দুটো ডিমের সাদা অংশ খান।
- দুধ-চিনি ছাড়া হলে চা/ কফিতে কোনো বাধা নেই। কৃত্রিম চিনি ব্যবহার করতে পারেন।
- রান্নায় বেশি পানি ব্যবহার করুন। তেল, মসলা যত পারেন কমিয়ে দিন।
- রান্নায় তেল কমানোর জন্য ননস্টিক প্যান ব্যবহার করুন।
- দই, নারকেল, ঘি, ডালডা- এসব দিয়ে রান্না করবেন না। ভুনা খাবার বাদ দিন।
- সারা দিনে প্রচুর পানি (৬ থেকে ৮ গ্লাস) পান করুন। খাওয়ার আগে ১ থেকে ২ গ্লাস পানি পান করুন। এতে দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে আপনার পেট ভরার অনুভূতি আসবে।
- খাবার গেলার আগে ভাল করে চিবিয়ে নিন। রান্না করতে করতে খাওয়ার অভ্যাস বাদ দিন।

- খাওয়ার সময় টিভি দেখা, খবরের কাগজ পড়া ও বন্ধু বা পরিবারের অন্যদের সাথে গল্প করা বাদ দিন।
- স্নেহবর্জিত দুধ বেছে নিন কিংবা দুধ জাল দিয়ে ঠান্ডা করার পর দুধের সর সরিয়ে নিন।
- সালাদে কোনো মাছ বা মাংসের টুকরো মেশাবেন না। বরং কিছু মশলা যোগ করতে পারেন।
- তাজা ফল খান, কাস্টার্ড বা জুস হিসেবে নয়।
- উচ্চ ক্যালরির খাবার বাদ দিয়ে কম ক্যালরির খাবার দিয়ে একটা সুষম খাদ্যতালিকা তৈরি করুন এবং তা মেনে চলুন।
- স্বাস্থ্যকর ওজন অর্জন ও নিয়ন্ত্রণ করুন।
- নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমযুক্ত কাজে ব্যস্ত থাকুন (সপ্তাহে বেশির ভাগ দিনে কমপক্ষে ৩০ মিনিট ধরে মাঝারী ধরনের শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত থাকুন)।

সামাজিক ক্ষেত্রে

- শরীরিক কাজকর্মের জন্য নিরাপদ অঞ্চল গড়ে তোলা ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- শহরের প্রতিটি এলাকায় পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরি করা।
- স্কুলে শিশু-সেবা সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্যশিক্ষা জোরদার করা।
- মাতৃদুগ্ধপান প্রকল্পকর্মীদের সহায়তা প্রদান।

বেসরকারি ক্ষেত্রে

- চিনিযুক্ত, লবণ এবং প্রক্রিয়াজাত চর্বিযুক্ত খাদ্য উৎপাদন কমাতে স্বেচ্ছাপ্রণোদনা সৃষ্টি।
- সকল ভোক্তার জন্য স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী মূল্য নিশ্চিত করা।
- জাঙ্ক ফুড বাজারজাতকরণ পরিহার করা, বিশেষ করে, শিশুদের জন্য।
- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ এবং নিয়মিত শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার বিষয়টি অনুশীলন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

সরকারি ক্ষেত্রে

- খাবার গ্রহণ এবং শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার বিষয়ে গণমাধ্যম ও অনান্য মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা।
- ফাস্টফুডের ওপর কর আরোপ এবং পারিবারিকভাবে উৎপাদিত ডাল ও শাক-সবজি প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দেয়া।
- স্বাস্থ্যনীতি উন্নয়ন করা এবং হাঁটা, বাইসাইক্লিং, খেলাধূলা ও অন্যান্য শারীরিক কসরতের সুযোগসমৃদ্ধ পরিবেশ তৈরি করা।
- স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করার জন্য কঠোর নিয়ম আরোপ করা।

স্থূলতা এবং মাতৃত্ব

- স্থূলতাজনিত সমস্যাগুলো প্রতিরোধের সবচাইতে ভালো পন্থা হচ্ছে- গর্ভধারণের আগেই ওজন নিয়ন্ত্রণ করা বা কমানো।
- অল্প পরিমাণ ওজন কমানোও (বর্তমান ওজনের ৫-৭ শতাংশ অথবা প্রায় ১০ থেকে ২০ পাউন্ড) শারীরিক অবস্থার উন্নতি করে এবং স্বাস্থ্যকর মাতৃত্বের পথ খুলে দেয়।

নিচের তথ্যগুলি থেকে সত্য/মিথ্যা খুঁজে বের করুন

১) অতিরিক্ত খাদ্যাভাস, কম শারীরিক পরিশ্রম ও অতিরিক্ত ধূমপান- ওজনাধিক্য ও স্থূলতার অন্যতম কারণ।

২) স্থূলতা মাপার সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে বিএমআই।

৩) মায়ের স্থূলতা ভবিষ্যতে মা ও শিশুর ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়।

৪) স্থূলতাজনিত সমস্যা গুলোর প্রতিরোধের সবচাইতে ভাল পন্থা হচ্ছে, গর্ভধারণের পূর্বেই ওজন নিয়ন্ত্রণ করা।

৫) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবস্থা ও নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করার মাধ্যমে স্থূলতার ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

মডিউল ৩

নবম অধ্যায়

রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া)

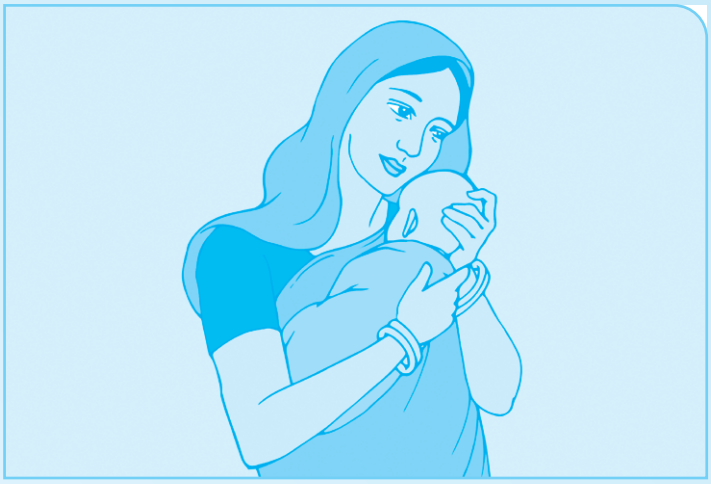

উদ্দেশ্য

- রক্তস্বল্পতা এবং এর স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কিত ধারণা দেয়া

রক্তস্বল্পতা

রক্তের অন্যতম প্রধান উপাদান লাল অংশের (লোহিত কণিকা) হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়াকে রক্তস্বল্পতা বলে। অপুষ্টিজনিত রক্তস্বল্পতা বলতে আমরা প্রধানত আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতাকেই বুঝি।

তথ্যসমূহ

- পৃথিবীতে ৩০ শতাংশের অধিক মানুষ রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত।
- উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রতি দুই জনের মধ্যে একজন গর্ভবতী মা রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত।
- মোট মাতৃমৃত্যুর ২০ শতাংশ রক্তস্বল্পতার কারণে হয়ে থাকে।
- বাংলাদেশে ৪৩ শতাংশের বেশি লোক রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন।
- ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪৮.১ শতাংশ গর্ভবতী মা রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত ছিলেন।

কারণসমূহ

- রক্ত তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় আয়রন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার কম খেলে
- কিছু রোগের কারণে, যেমন- কৃমি, ডায়রিয়া ও ম্যালেরিয়া ইত্যাদি হলে
- যে কোনো রক্তক্ষরণজনিত কারণে
- ঘন ঘন সন্তান হলে

প্রকারভেদ

- আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা
- ফলিক এসিডের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা
- ভিটামিন বি-১২-এর ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা

গর্ভাবস্থায় রক্তস্বল্পতার কারণ

- গর্ভে একাধিক শিশু থাকা
- ঘন ঘন সন্তান ধারণ করা (২ বছরের আগে)
- গর্ভাবস্থায় কম খাদ্য গ্রহণ ও সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা
- আয়রন ও ভিটামিনের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে
- খাদ্য সংক্রান্ত কুসংস্কার ও পরিবারে অসম খাদ্য বন্টন
- গর্ভধারণের পূর্বে রক্তস্বল্পতায় ভোগা
- কিশোরী অবস্থায় ও অল্প বয়সে গর্ভধারণ করা

গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের রক্তস্বল্পতার লক্ষণ

- দুর্বলতা, অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা
- শরীরের শক্তি কমে যাওয়া
- চোখের পাতার ভেতরের অংশ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া
- হাত বা পায়ের পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া

গর্ভাবস্থায় রক্তস্বল্পতার জটিলতা

আয়রন, ফলিক এসিড এবং ভিটামিন বি-১২-এর ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতার ঝুঁকি:

- অকালে সন্তান প্রসব এবং কম ওজনের শিশুর জন্ম হওয়া। ফলে শিশুর-
    - মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায়
    - বারবার রোগাক্রান্ত হয়
    - দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং কর্মক্ষমতা কমে যায়
    - এইসব শিশুদের ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিও বেড়ে যায়
    - শিশুর জন্মগত ত্রুটি দেখা দেয়
- গর্ভবতীর মায়ের মৃত্যুঝুঁকি বাড়ে
- অপুষ্টির ফলে শারীরিক গঠন ছোট হওয়ার কারণে সন্তান প্রসবে জটিলতার সৃষ্টি হয়
- প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী জটিলতা বেড়ে যায়

সনাক্তকরণ

- রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে-
    - রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ মাপা
    - রক্তে ভিটামিন বি-১২, ফলেট এবং আয়রনের মাত্রা দেখা এবং
    - রক্তের নির্দিষ্ট/ বিশেষ কিছু পরীক্ষা করা

চিকিৎসা

- আয়রন বড়ি/ট্যাবলেট ও আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া
- ফলিক এসিড ও ভিটামিন বি-১২ বড়ি/ট্যাবলেট খাওয়া
- গর্ভাবস্থায় নিয়মিত আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি/ট্যাবলেট খাওয়া

গর্ভাবস্থায় রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ

- গর্ভাবস্থায় নিয়মিত আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি ও আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া
- গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি খাদ্য এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ করা। বিশেষত প্রাণীজ খাবার (দুধ, ডিম, কলিজা) এবং গাঢ় সবুজ শাক সবজি ও মৌসুমী দেশি ফল-মূল বেশি খাওয়া।
- গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের পুষ্টির জন্য বেশি পরিমাণ আয়রনের প্রয়োজন। তাই তাদেরকে বেশি করে আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। যেমন-
    - কলিজা, মাংস (হাস, মুরগী, গরু, খাসি), মাছ
    - সিমবিচি, বুট, মটর, বাদাম

- কচু শাক ও অন্যান্য সবুজ শাকসবজি
- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল– পেয়ারা, জাম্বুরা, আমলকি, পাকা টমেটো ইত্যাদি।

নিচের তথ্যগুলি থেকে সত্য/মিথ্যা খুঁজে বের করুন

১) আয়রন ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতার প্রধান কারণ অপুষ্টি।

২) খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আয়রন, ফলিক এসিড ও ভিটামিন বি-১২-এর অভাবে রক্তস্বল্পতা হতে পারে।

৩) গর্ভবস্থায় আয়রন ও ভিটামিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

৪) রক্তস্বল্পতার কারণে গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

৫) আয়রনসমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে মাংস, কলিজা, সবুজ শাকসবজি ও টকফল অন্যতম।

সকল গর্ভধারণই হোক পরিকল্পিত
গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা প্রকল্প, বাডাস

মডিউল ৩

দশম অধ্যায়

উচ্চ রক্তচাপ

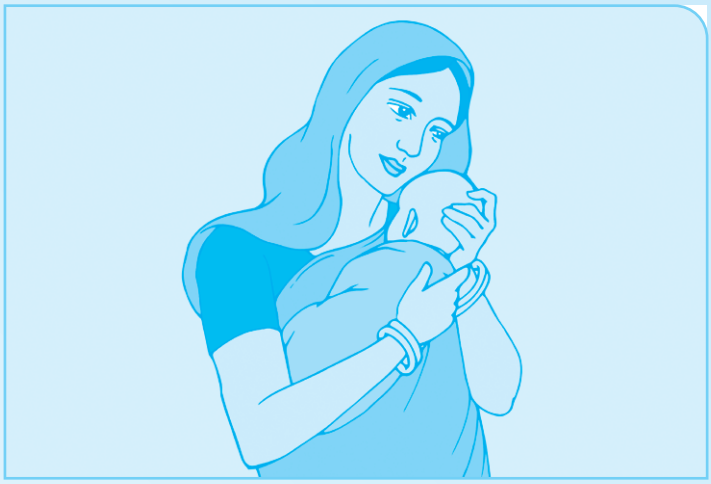

উদ্দেশ্য

- উচ্চ রক্তচাপ এবং এর স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কিত ধারণা দেয়া

উচ্চ রক্তচাপ

- রক্তচাপ হচ্ছে রক্তনালীর ওপরে রক্তের চাপ। পূর্ণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে সিস্টোলিক রক্ত ১৪০ মিমি মার্কারি বা তার ওপরে অথবা ডায়াস্টলিক রক্তচাপ ৯০ মিমি মার্কারি বা তার ওপরে হলে উচ্চ রক্তচাপ ধরা হয়ে থাকে।
- প্রি-হাইপারটেনশন বা প্রাথমিক উচ্চ রক্তচাপ হচ্ছে- সিস্টোলিক রক্তচাপ ১২০-১৩৯ মিমি মার্কারি অথবা ডায়াস্টলিক রক্তচাপ ৮০-৯০ মিমি মার্কারি। এই গ্রুপের রোগীদের ভবিষ্যতে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে।
- স্বাভাবিক রক্তচাপ হচ্ছে- সিস্টোলিক রক্তচাপ ১২০ মিমি মার্কারির কম এবং ডায়াস্টলিক রক্তচাপ ৮০ মিমি মার্কারির কম।

তথ্যসমূহ

- বিশ্বে হৃদরোগের প্রধান কারণ উচ্চ রক্তচাপ।
- ২০১৪ সালে পৃথিবীতে ২২ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক লোক উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ছিলেন। ২০২৫ সালে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১.৫৬ বিলিয়ন।
- বিশ্বে অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ হলো উচ্চ রক্তচাপ।
- প্রতি বছর উচ্চ রক্তচাপে ৯ মিলিয়ন লোক মারা যায়।
- উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত মানুষদের মধ্যে ৫০ শতাংশের পরবর্তী সময়ে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে।
- ২০১৪ সালে বাংলাদেশে প্রায় ২৫.৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (২৫.১ শতাংশ পুরুষ ও ২৬.১ শতাংশ নারী) উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ছিলেন।
- উচ্চ রক্তচাপকে অনেক সময় নিরব ঘাতক বলা হয়, কারণ বেশিরভাগ সময় তেমন কোনো উপসর্গই থাকে না। তাই অনেকে মনে করে, তার কোনো উচ্চ রক্তচাপ নেই। তাই নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করার মাধ্যমেই এই রোগ নির্ণয় করা উচিত।

প্রকারভেদ

- এসেনশিয়াল হাইপারটেনশন: শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ রোগীর উচ্চ রক্তচাপের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ধরনের উচ্চ রক্তচাপকে এসেনশিয়াল হাইপারটেনশন বলে।
- সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন: কিছু ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। এ জাতীয় উচ্চ রক্তচাপ কিডনি রোগ, জন্মগত ত্রুটি অথবা অন্যান্য কারণে হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এই জাতীয় রক্তচাপের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাও সম্ভব।

ঝুঁকিসমূহ

- বয়স বেশি হলে
- উচ্চ রক্তচাপের পারিবারিক ইতিহাস
- ওজনাধিক্য বা স্থূলতা
- শারীরিক পরিশ্রম না করা
- তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করা

- ধুমপান
- খাবারে বেশি লবণের ব্যবহার
- মানসিক চাপ

জটিলতা

- বুকে ব্যথা এবং অনিয়মিত হৃদস্পন্দন
- ট্রানজিয়েন্ট ইশকেমিক অ্যাটাক (মিনি স্ট্রোক), ব্রেইন স্ট্রোক
- চোখের রেটিনায় সমস্যা (রেটিনোপ্যাথি) ও অন্ধত্ব
- স্নায়ুরোগ
- কিডনি বিকল হয়ে যাওয়া

চিকিৎসা

১. জীবনযাপনে পরিবর্তন

২. ওষুধ

প্রতিরোধ

- শরীরের স্বভাবিক ওজন বজায় রাখা।
- তাজা ফলমূল, শাকসবজি বেশি খাওয়া এবং চর্বি জাতীয় খাবার কম খাওয়া।
- খাওয়ার লবণ কম করে খেতে হবে। প্রতিদিন ৫ গ্রামের কম লবণ খেতে হবে। পাতে লবণ পরিহার করতে হবে।
- নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করতে হবে। যেমন- দৌড়ানো, হাঁটা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি। দৈনিক কমপক্ষে ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে পাঁচদিন হাঁটলেই যথেষ্ট।
- সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে ধূমপান পরিহার করতে হবে।
- মদ্যপান পরিত্যাগ করতে হবে।
- বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, সাদাপাতা, গুল ইত্যাদি পরিহার করতে হবে।

গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপ

গর্ভধারণের ২০ সপ্তাহ পরে, প্রসবকালীন ও প্রসবের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তাকে গর্ভজনিত উচ্চ রক্তচাপ বলে।

গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপের প্রভাব

- গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপে কিডনি, হৃদপিন্ড, যকৃত, মস্তিষ্ক ও জরায়ুতে রক্ত সরবরাহ কমে গিয়ে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে। ফলে মায়ের মৃত্যুও হতে পারে।
- গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপে পর্যাপ্ত রক্ত গর্ভফুলের মাধ্যমে বাচ্চার শরীরে পৌঁছাতে পারে না, ফলে অপরিণত শিশু, কম ওজনের শিশু জন্ম নিতে পারে এবং প্রসবকালীন শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে

- দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ রক্তচাপ
- প্রি-একলাম্পশিয়া ও একলাম্পশিয়া
- গর্ভজনিত উচ্চ রক্তচাপ

নিচের তথ্যগুলি থেকে সত্য/মিথ্যা খুঁজে বের করুন

১) হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ উচ্চ রক্তচাপ।

২) উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরবর্তী সময়ে ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি বেশি।

৩) ওজনাধিক্য ও খাবারে বেশি লবণের ব্যবহার উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়।

৪) উচ্চ রক্তচাপের কারণে স্ট্রোক, হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ ও কিডনির সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৫) জীবনযাপনে পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

মডিউল ৩

একাদশ অধ্যায়

প্রি-একলাম্পশিয়া ও একলাম্পশিয়া

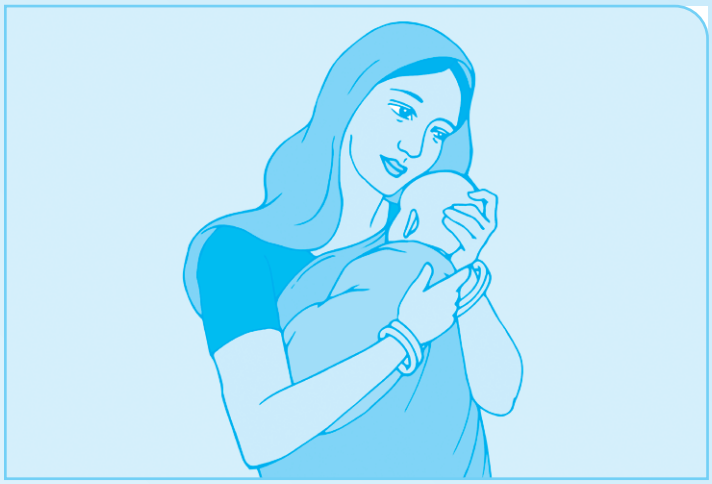

উদ্দেশ্য

- প্রি-একলাম্পশিয়া ও একলাম্পশিয়া সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি, চিকিৎসা এবং এর প্রতিরোধ সম্পর্কিত ধারণা দেয়া

প্রি-একলাম্পশিয়া ও একলাম্পশিয়া

প্রি-একলাম্পশিয়া (খিঁচুনি-পূর্বাবস্থা): গর্ভজনিত উচ্চ রক্তচাপের সাথে প্রস্রাবে অ্যালবুমিনের উপস্থিতি থাকলে তাকে প্রি-একলাম্পশিয়া বলে।

একলাম্পশিয়া (খিঁচুনি): গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপ, প্রস্রাবে অ্যালবুমিনের উপস্থিতিসহ খিঁচুনি হওয়াকে একলাম্পশিয়া বলে। সাধারণত গর্ভধারণের ২০ সপ্তাহ পরে, প্রসবের সময় অথবা প্রসবের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে খিঁচুনি হয়। তবে প্রসবের ১০ দিনের মধ্যেও হতে পারে।

তথ্যসমূহ

- বিশ্বে ১০ শতাংশ গর্ভধারণে উচ্চ রক্তচাপ সংক্রান্ত জটিলতা দেখা যায়।
- গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপ সংক্রান্ত জটিলতার অর্ধেক প্রি-একলাম্পশিয়া এবং একলাম্পশিয়া।
- বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর ২০ শতাংশ হয়ে থাকে প্রি-একলাম্পশিয়া ও একলাম্পশিয়ার কারণে।
- বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ হলো একলাম্পশিয়া (খিঁচুনি)।

ঝুঁকিসমূহ

- গর্ভধারণের আগে থেকেই যাদের উচ্চ রক্তচাপ ছিল
- আগের গর্ভধারণের সময় যাদের উচ্চ রক্তচাপ ও প্রি-একলাম্পশিয়া ছিল
- গর্ভধারণের আগে থেকেই যারা স্থূলকায়
- ২০ বছরের কম অথবা ৪০ বছরের বেশি বয়সে গর্ভধারণ করলে
- অধিক সন্তান জন্মদান করলে
- নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা

লক্ষণ

- উচ্চ রক্তচাপ (যদি চার ঘন্টার ব্যবধানে দু' বার রক্তচাপ ১৪০/৯০ মিমি মার্কারি বা তার বেশি পাওয়া যায়)
- শরীরে অতিরিক্ত পানি আসার কারণে হঠাৎ ওজন বেড়ে যাওয়া। হঠাৎ পায়ে পানি আসা একটি বিপজ্জনক চিহ্ন, যার ফলে খিঁচুনি হতে পারে
- প্রস্রাবে অ্যালবুমিনের উপস্থিতি এবং এ ক্ষেত্রে মুত্রনালির সংক্রমণের কোনো চিহ্ন না থাকা
- মাথা ব্যথা অথবা ক্রমশ প্রচন্ড মাথাব্যথা হওয়া
- চোখে দেখতে সমস্যা (ঝাপসা দেখা বা একই বস্তু দুটো দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বলক্ষণ)
- বমিবমি ভাব বা অতিরিক্ত বমি
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া

জটিলতাসমূহ

- স্ট্রোক
- হার্ট ফেইলিওর
- ফুসফুসে পানি আসা
- অন্ধত্ব
- প্রসবের পরে রক্তক্ষরণ

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- প্রসব হচ্ছে খিঁচুনির একমাত্র চিকিৎসা
- চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হলো:
  - খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণ করা
  - উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা
  - কার্যকর প্রসবের জন্য পদক্ষেপ নেয়া। যদি রোগী উচ্চ রক্তচাপ আগেই নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয় তবে সে গর্ভধারণের জন্যে ভালো অবস্থায় থাকবে। তাকে খিঁচুনি প্রতিরোধে সর্বোপরি সকল ধরনের সহযোগিতা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
  - যে সব মহিলার খিঁচুনি আছে, তাদের মাতৃত্বকালীন সেবা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে হবে।
  - যারা উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে আছেন তাদের খাদ্যে ক্যালসিয়াম গ্রহণের পরিমাণ কম থাকলে প্রতিদিন অন্তত এক গ্রাম করে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে হবে ।
  - যে সব মহিলা মারাত্মক ঝুঁকিতে আছেন তাদের গর্ভধারণের ২০ সপ্তাহ পর থেকেই নির্দিষ্ট পরিমাণ এসপিরিন খেতে হবে।

নিচের তথ্যগুলি থেকে সত্য/মিথ্যা খুঁজে বের করুন

১) গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপসহ খিঁচুনি হওয়াকে একলাম্পশিয়া বলে।

২) ২০ বছরের নিচে গর্ভধারণ করলে একলাম্পশিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

৩) শরীরে অতিরিক্ত পানি আসা বা প্রস্রাবে অ্যালবুমিন আসা একলাম্পশিয়ার পূর্বলক্ষণ।

৪) একলাম্পশিয়ার কারণে স্ট্রোক,অন্ধত্ব, হার্ট ফেইলিওরের ঝুঁকি বাড়ায়।

৫) যারা একলাম্পশিয়ার ঝুঁকিতে আছেন তাদের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মডিউল ৩

দ্বাদশ অধ্যায়

মূত্রনালির সংক্রমণ (ইউটিআই)

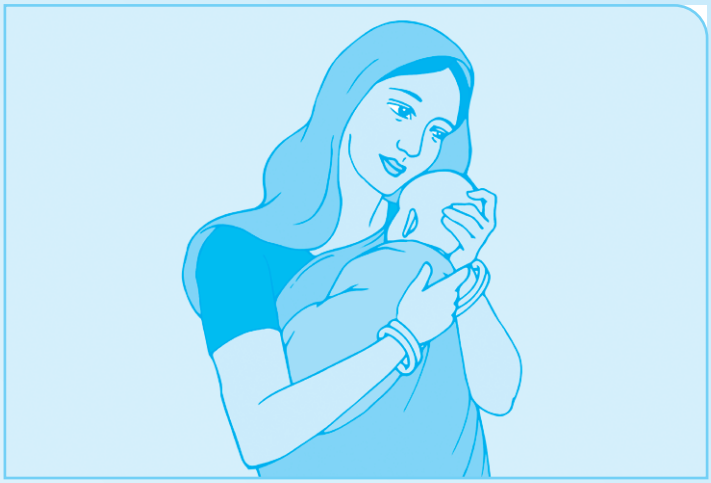

উদ্দেশ্য

- গর্ভবতী মা ও প্রজননক্ষম নারীদের মূত্রনালির সংক্রমণ সম্পর্কে অবগত করা
- মূত্রনালির সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে জানা

মূত্রনালির সংক্রমণ (ইউটিআই)

বাংলাদেশে মূত্রনালির সংক্রমণ বিশেষ করে, মহিলাদের একটি বড় সমস্যা। মূত্রনালির সংক্রমণ হলে মূত্রনালিতে প্রদাহ হয়। মূত্রনালির সংক্রমণ গর্ভাবস্থায় বেশি জটিল, কারণ এসময় মূত্রনালির কিছু পরিবর্তন হয়। গর্ভধারণের সময় বাড়ার সাথে সাথে জরায়ু বড় হয় এবং মূত্রথলির ওপর চাপ দেয়, ফলে প্রস্রাব সম্পূর্ণভাবে মূত্রথলি থেকে বের হতে না পারার কারণে সংক্রমণ বা ইনফেকশন হয়।

তথ্যসমূহ

- বিশ্বে প্রতি ৫ জন নারীর মধ্যে একজন জীবনে অন্তত একবার মূত্রনালির সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে থাকে।
- এর মধ্যে ২০ শতাংশের কাছাকাছি নারী সেরে ওঠার পর পুনরায় আক্রান্ত হয়ে থাকে।
- ৮০ থেকে ৯০ ভাগ মূত্রনালির সংক্রমণের কারণ ই-কলাই নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া।
- গর্ভবতী মহিলাদের ৬ সপ্তাহ থেকে ২৪ সপ্তাহের মধ্যে মূত্রনালির সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে।

লক্ষণ

- প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া বা ব্যথা হওয়া
- ঘন-ঘন প্রস্রাবের চাপ হওয়া, ফোঁটায় ফোঁটায় সামান্য প্রস্রাব নির্গত হওয়া
- বিরামহীন ব্যথা এবং তলপেটে ব্যথাযুক্ত চাপ অনুভূত হওয়া
- অস্বচ্ছ ও রক্তাভ বর্ণের প্রস্রাব
- প্রস্রাবে দুর্গন্ধ হওয়া
- জ্বর হওয়া

গর্ভবতীদের মূত্রনালি সংক্রমণের প্রভাব

মূত্রথলি গর্ভাবস্থায় বেশি সংবেদনশীল থাকে। এই সময় সংক্রমণ হলে কিডনিতে দ্রুত ছড়াতে পারে। যদি গর্ভবতী নারীর এই সংক্রমণের সঠিক চিকিৎসা না হয়, তবে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন:

- কম ওজনের শিশুর জন্ম
- অকালে সন্তান প্রসব
- উচ্চ রক্তচাপ
- প্রি-এক্লাম্পশিয়া
- মায়ের রক্তস্বল্পতা
- অ্যামনিওটিক ফ্লুয়িডের ইনফেকশন

চিকিৎসা

- মূত্রনালির সংক্রমণের চিকিৎসা অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। চিকিৎসার বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হয়। সংক্রমণ সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসক এক বা দুই সপ্তাহ অ্যান্টিবায়োটিক সেবন বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইনজেকশনের মাধ্যমে করিয়ে থাকেন। সংক্রমণ কিডনিতে বিস্তৃত হলে কয়েক সপ্তাহ অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হতে পারে।
- পাশাপাশি চিকিৎসক প্রচুর পানীয় পান করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

প্রতিরোধ

- নিয়মিত প্রচুর পানি পান করবেন।
- প্রস্রাবের চাপ অনুভব করলে, কখনোই বাথরুমে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন না।
- প্রতিদিন এবং শারীরিক মিলনের পর গোপনাঙ্গ পরিষ্কার রাখুন।
- শারীরিক মিলনের আগে ও পরে এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগে অবশ্যই প্রস্রাব করুন।

নিচের তথ্যগুলি থেকে সত্য/ মিথ্যা খুঁজে বের করুন

১) গর্ভবতী মহিলাদের মূত্রনালির সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে।

২) গর্ভকালীন মূত্রনালির সংক্রমণের সঠিক চিকিৎসা না করালে কম ওজনের শিশুর জন্ম ও অকালে সন্তান প্রসবের ঝুঁকি বাড়ে।

৩) মূত্রনালির সংক্রমণ কিডনিতে বিস্তৃত হয়ে কিডনির সমস্যা তৈরি করতে পারে।

৪) প্রচুর পানি পান মূত্রনালির সংক্রমণ প্রতিরোধ করে থাকে।

৫) ২০ শতাংশের কাছাকাছি নারী সেরে ওঠার পর পুনরায় মূত্রনালির সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র

১. ডায়াবেটিস এটলাস (৭ম সংখ্যা, ২০১৫), ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন ২০১৫

২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওয়েব সাইট

৩. ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন ওয়েব সাইট

৪. ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি ফেডারেশন ওয়েব সাইট

৫. আমেরিকান কলেজ অফ অবসটেট্রিশিয়ানস এন্ড গাইনিকোলজিস্টস ওয়েব সাইট

৬. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ওয়েব সাইট

৭. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ওয়েব সাইট

৮. বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ও হেলথ্ সার্ভে রিপোর্ট ২০১১

৯. ডায়াবেটিস মেলাইটাস (৪র্থ সংখ্যা, ২০১৪), সার্টিফিকেট কোর্স অন ডায়াবেটোলজি, ডিসটেন্স লার্নিং প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি

সকল গর্ভধারণই হোক পরিকল্পিত
গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা প্রকল্প, বাডাস